আধুনিক অসমিয়া কবিতার বিবর্তন

হরেকৃষ্ণ ডেকা

ভাষান্তর : তুষারকান্তি সাহা

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, এই আলোচনায় অসমিয়া কবিতার বিবর্তনের বিষয়টি আধুনিক যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে। এর কারণ, পৌরাণিক সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত অসমিয়া কবিতার বিবর্তনের যে-ধারা বয়ে এসেছে তাতে বিবর্তনের চাইতে বিভাজনের দিকটি (ইংরেজিতে যাকে break বলা হয়ে থাকে) স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন সাহিত্যের মূল চালিকাশক্তি ছিল ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা। লৌকিক সাহিত্যচর্চা কেউ কেউ করলেও তার ধারা ছিল ক্ষীণ। এমন-কি পীতাম্বরের মতো কবিকে 'গর্ব পর্বতে' আরোহণের জন্য শংকরদেব 'ধর্ম রক্ষার যোগ্য নয়' বলেও নিন্দা করেছিলেন। ষোড়শ শতকে শংকরদেব, মাধবদেব ও তাঁদের সতীর্থ তথা কয়েকজন শিষ্যের কাব্যচর্চায় অসমিয়া সাহিত্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে এবং শংকরদেব-মাধবদেবের ভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট সাহিত্যে অতি উচ্চ পর্যায়ের সাহিত্য-প্রতিভার স্বাক্ষর ফুটে ওঠে। কিন্তু আধুনিক যুগের অসমিয়া সাহিত্যে কাব্যরীতি, কাব্যভাষা ও কাব্যরসে এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন এতটাই দৃশ্যমান যে, যুগের পরিবর্তন এক গতিশীল সাহিত্যে বিবর্তন আনার চেয়ে একটা বিভাজন সৃষ্টি করে এক ধরনের নতুন সাহিত্যের জন্ম দেয়। এ এক যুগ-চেতনারই পরিবর্তন, সাল-তারিখ ধরে ভাবজগতে কোনো একটা যুগের পরিবর্তন নয়। মানবসমাজ এক শতাব্দী থেকে আরেক শতাব্দীতে পদার্পণ করার মধ্যেও তার পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল বলেও মনে করা যায় না। ভারত তথা অসমের ক্ষেত্রে যুগ-পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনাধিকার ব্রিটিশের কবলে আসার পর। এই পরিবর্তনের যদি একটি বিশেষ সাল-তারিখের সন্ধান করা হয় তাহলে ভারতের ক্ষেত্রে ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গের শাসনভার দখল করার সময়সীমার মধ্যে একটি প্রধান রেখা পাওয়া যাবে এবং অসমের ক্ষেত্রে ১৮২৬ সালের মান (বার্মিজ) ও ব্রিটিশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ইয়ান্ডাবু সন্ধিতে রেখা টানতে হবে।

ব্রিটিশ শাসন যে কেবল প্রশাসনীয় পদ্ধতির পরিবর্তন এনেছিল এমন নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি ও চিন্তাধারার স্রোতও বয়ে নিয়ে এসেছিল। ব্রিটিশ-আধিপত্যকে ভারতীয় শাসকরা নির্বিবাদে মেনে নেননি। তবে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামও সংঘটিত হয়নি এবং ব্রিটিশের সঙ্গে বা পরম্পরার সঙ্গে লড়াই করে শক্তিহীন হয়ে-পড়া দেশীয় শাসকদের সামর্থ্যও হারিয়ে গিয়েছিল। কৌশলী (কূট) ব্রিটিশ এক সুস্থির শাসনপদ্ধতির প্রবর্তন করে ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রচেষ্টাকে রক্ষণশীলতা থেকে মুক্তির আদর্শ হিসেবে এক প্রজাহিতকর শান্তির শাসন রূপে যেন দেখানোর চেষ্টা করেছিল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে প্রশাসনে সহযোগ করতে ব্রিটিশ-অনুগত একটি শ্রেণির জন্ম দিয়েছিল। এর ফলে একশ্রেণির শিক্ষিত মসিজীবী মধ্যবিত্ত লোক সমাজ-জীবনে প্রথম সারিতে এগিয়ে আসতে থাকে। পশ্চিমের জ্ঞানের দুয়ারের সন্ধান পেয়ে উন্নতিকামী এই শ্রেণির

লোকেরা ইংরেজ-শাসকদের প্রতি আনুগত্য দেখাতে থাকে। ভারতীয় নব্যশিক্ষিত শ্রেণির মনে এই পরিবর্তনের ঢেউ অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠীর প্রদর্শিত পরিকল্পিত পথে পশ্চিমি-উদারতান্ত্রিক সমাজচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই নতুন ভারতীয় মধ্যবিত্তরা পৌরাণিক জীবনবোধ থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিমি আধুনিকতাকে গ্রহণ করার জন্য উৎসুক হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি পৌরাণিক জীবন-প্রথাকে রক্ষণশীল বলে মনে করতে শুরু করে এবং পশ্চিমি সাংস্কৃতিক পরম্পরাগত জীবন-প্রথার সঙ্গে সংঘাতে না-গিয়ে নিজেদের তার সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা চালায়।

এটা ঠিক যে, বাংলার নবজাগরণের পালে পাশ্চাত্য জ্ঞানের হাওয়া উৎকৃষ্ট সৃজনশীলতার প্রেরণা জুগিয়েছিল। বাঙালির মনে জাতীয় চেতনা সুপ্ত থাকেনি, বরং জাতীয় পরম্পরার মধ্য দিয়ে নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যেই প্রবহমান ছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্বমনীষার প্রতি নতুন আগ্রহ বা প্রবণতা তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে এক সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধিত হয়ে আধুনিকতার সৃষ্টি করে।

অসমে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্য-ভাবধারার আগমন ঘটেছিল এমন কথা বলা যায় না। এর আগমন ঘটেছিল ক্রমান্বয়ে, কলকাতায় অধ্যয়নরত অসমের ছাত্রদের মাধ্যমে এবং কিছুসংখ্যক উচ্চবর্গের অসমিয়া সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ কর্মকর্তা, কর্মচারী, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সংস্পর্শের মাধ্যমে। অসমে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পর ব্রিটিশরা সরকারি কাজকর্ম ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষাকেই অসমে প্রবর্তন করে। অসমিয়া ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি লাভের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে বৌদ্ধিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয় এবং ১৮৭৩ সালে সেই স্বীকৃতি মেলে। প্রকৃতপক্ষে ভাষা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অসমিয়া মানুষের মনে ভাষিক জাতীয় চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এর ফলে বাংলা ভাষার প্রতি এক ধরনের ঈর্ষা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হলেও তা বাংলা সাহিত্যের প্রতি কোনো ধরনের বিরূপতার সৃষ্টি করেনি। কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশ বাংলা সাহিত্যের নতুনত্বের যে-পরিচয় সেই সময়ে সেখানে অধ্যয়নরত অসমিয়া ছাত্রদের দিয়েছিল সেই উজ্জীবিত পরিবেশ তাদের জন্য যেন এক আলোকপ্রাপ্তির বার্তাও বয়ে নিয়ে আসে। ফলে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতা তাদের জন্যও আধুনিকতার এক নিদর্শন-সদৃশ হয়ে ওঠে। তৎকালীন শিক্ষিত অসমিয়া যুব-প্রজন্মও বাঙালি শিক্ষিতদের ধ্যানধারণা অনুসরণ করে প্রাচীন ভাবাদর্শে আবদ্ধ অসমিয়া জীবনচর্যার মধ্যে নানাবিধ রক্ষণশীলতা ছাড়াও উদ্যমহীনতা বা এক ধরনের জড়তা লক্ষ করেছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অসমের সজীব লোকসংস্কৃতি-সহ জাতীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ যুবসমাজ এর বিরোধিতার প্রয়োজন অনুভব করেনি। আধুনিকতাকে গ্রহণ করার পরও এরা প্রবহমান লোকসংস্কৃতির সজীবতার দিকটিতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। যদিও একধরনের কোটপ্যান্ট-পরা সাহেবিয়ানা ও উন্নাসিকতার মনোভাবসম্পন্ন একদল নব্যশিক্ষিতের মধ্যে কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল। তবুও বৌদ্ধিক ঔৎসুক্যেভরা চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পাশ্চাত্য উদারতান্ত্রিক প্রবাহ থেকে আগত চিন্তাচর্চার ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে।

ব্রিটিশ প্রশাসকদের একাংশের ভুলের জন্য বাংলাভাষা অসমে প্রবর্তিত হওয়ায় অসমিয়াদের মধ্যে যে-সংকটভাবনার জন্ম হয় তার প্রতিক্রিয়ায় ভাষিক জাতীয়তাবোধও ওইসব মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। ফলে অসমিয়া ভাষার উন্নতি উক্তপন্থীদের অভীষ্ট লক্ষ্য হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, পশ্চিমি শিক্ষার আলোয় এই অভীষ্টের সিদ্ধির সন্ধান করা হয়েছিল। যেহেতু ভাষার সংকটের চিন্তা বাংলাভাষার প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে উদিত হয়েছিল সেহেতু আপন ভাষার প্রকাশক্ষমতা ও তার সাহিত্যকে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সমকক্ষ হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব অনুভব করে তারা। কিন্তু অগ্রগতির এই অন্বেষণে নব্য বাংলা সংস্কৃতি ছাড়া অসমিয়াদের সামনে তখন অন্য কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না। অসমিয়া ভাষা-সাহিত্যের আধুনিকতার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বঙ্গীয় নিদর্শনের এই মিশ্রণ কোনো অপকার করেনি, বরং আধুনিকতায় প্রবেশ করার ভাষিক পথটি এই মিশ্রণ অনেকখানি মসৃণ করে তুলেছিল। অপরদিকে, বাংলাভাষার সঙ্গে বিরোধ থেকে উদ্ভূত ভাষিক জাতীয়তাবোধ অসমিয়া ভাবধারাকে আপন সংস্কৃতির সজীব হাওয়ার প্রতি সজাগ হতেও সতর্ক করে দেয়। ফলে পোশাকআশাক ও চালচলনে কিছু পরিমাণ সাহেবিয়ানা এলেও অসমিয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত অংশটি ভুয়ো আধুনিকতার দাসত্বে আবদ্ধ না-থেকে নিজেদের প্রবহমান সাংস্কৃতিক পরম্পরার সঙ্গেও সংযোগ রক্ষা করে চলেছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জীবনস্মৃতি বা পদ্মনাথ

গোহাঞি বরুয়ার রচনায় এমনতরো অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। অবশ্য জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রে বেজবরুয়ার মধ্যে জাতীয় গৌরব বেশি প্রবল ছিল। কারণ গোহাঞি বরুয়ার মতো সেখানে রাজ-আনুগত্যের প্রভাব পড়েনি।

অসমিয়া ভাষা-সাহিত্যের নতুন চর্চার নেপথ্যে এ-ধরনের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছিল এবং তার ভিতর দিয়েই এটি আধুনিক যুগে পদার্পণ করে। ভাষা-সাহিত্যের এই আধুনিক যুগটি 'অরুনোদই'-এর পাতায় শুরু হয়েছিল (এ-ক্ষেত্রে ছাপাখানার প্রচলন বিশেষ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে), কিন্তু এই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে সাহিত্যোপযোগী ও প্রকাশক্ষম এক মান্য আধুনিক ভাষা কথ্যভাষা থেকে বেশি সুন্দর হয়ে উঠতে পারেনি। তার পরীক্ষামূলক অক্ষরবিন্যাসও সকলের গ্রহণযোগ্য হয়নি। রস প্রকাশের চেয়ে নতুন চিন্তা ও উপদেশাবলি প্রকাশই পত্রপত্রিকাগুলোর রচনার উদ্দেশ্য ছিল। হেমচন্দ্র বরুয়ার 'আসাম নিউজ'-এ আধুনিক অসমিয়া ভাষার বাঁধন দৃঢ় হতে শুরু করে এবং তদ্ভব, তৎসম ও শুদ্ধ স্থানীয় (থলুয়া) শব্দসম্ভারের একটি সমন্বয় ঘটতে থাকে। 'আসাম বন্ধু' সাময়িকপত্রের দু-একটি কবিতায়ও আধুনিক ভাষারীতি আয়ত্তে আসার লক্ষণ দেখা যায়। তবে তার গঠন ছিল দুর্বল এবং ধ্বনির বিন্যাসও ছিল তখন নড়বড়ে। প্রাচীন পদ্যছন্দগুলির কৌশলী মিশ্রণে আধুনিক ছন্দ সৃষ্টির প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় ওই পত্রিকার কিছু কবিতায়। কবিতাগুলোতে কবিদৃষ্টি আধুনিক ভাবজগৎ থেকে এসে 'সেকুলার' ভাবজগতের আনন্দ-বিষাদের অনুভূতি নিয়ে ব্যক্তিহৃদয়ে প্রবেশ করতে থাকে। তার জন্য দৃঢ়বদ্ধ পদ্যছন্দের বাঁধন শিথিল করার প্রয়োজন হয় এবং সে-প্রয়াসও ফুটে ওঠে 'আসাম বন্ধু'-র কিছু কিছু কবিতায়। এর কয়েকটি কবিতায় দেখা যায়, কবির মুগ্ধ দৃষ্টিতে রোমান্টিক কল্পনার স্পর্শ লেগেছিল। উদাহরণ স্বরূপ সত্যনাথ বরার 'ফুলনি' কবিতার শেষের দিকের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

'রজনীগন্ধার আনন্দ অপার
মুখত নধরে হাঁহি
রূপ বরণীয়া জোনাকো জিনিয়া
ফুলি আছে তিনি পাহি।
বতাহত হালি ক'রে কোলাকোলি
ইডালে সিডালে ধরি।
চুমা আলিংগন দিয়ে আগণন
সাপটা সাপটি করি।'

(রজনীগন্ধার আনন্দ অপার
মুখে যে ধরে না হাসি
মোহিনী জ্যোৎস্নার পরশ নিয়ে
ফুটে আছে তিন পাপড়ি।
বাতাস হেলিয়া করে কোলাকুলি
এ-শাখা সে-শাখা ধরে
চুমা-আলিঙ্গন দেয় অগণন
সাপটাসাপটি করে।)

এখানে অনুপ্রাসের স্পন্দনময় ব্যবহার দেখা যায়। অবশ্য এই প্রয়োগ নতুন বলা যায় না। এ-রকম অনুপ্রাসের ব্যবহার পুরনো কবিতায়ও সার্থকভাবে হয়েছিল। শংকরদেবের 'হরমোহন'-এ একটি অনুপম দিব্য উপবন আছে এবং অসমে জাত বিভিন্ন ফুলের গাছের সমাহার অনুপ্রাসে পদবন্ধ হয়ে এটি অতি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সত্যনাথ বরার 'ফুলনি' কবিতার বর্ণনা 'হরমোহন'-এর দিব্য উপবনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'হরমোহন'-এর দিব্য উপবনে জড় প্রকৃতির এক অপরূপ রূপ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সত্যনাথ বরার কবিতায় 'ফুলনি' মানবীয় অনুভূতিতে স্পন্দিত। 'কোলাকোলি করা' ও 'চুমা আলিংগন দিয়া' প্রভৃতি জড় প্রকৃতি হয়ে থাকেনি। সেখানে কবি-কল্পনা প্রাণের সঞ্চার করেছে। কিন্তু এতে এক নতুন প্রকাশভঙ্গির সন্ধান পেলেও এই কবিতা ভাবের এক বর্ণনাতীত চিত্রের স্তরে পৌঁছতে পারেনি। এখানে কবিকল্পনা কোলরিজের বক্তব্য মাফিক secondary imagination-এর সৃজনীময় রূপান্তর করার ক্ষমতা অর্জন করতে সমর্থ হয়নি।

রোমান্টিক কবিতার সূচনা

১৮৮৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'জোনাকী' আলোচনী বা সাময়িকপত্রে মুদ্রিত কয়েকটি কবিতা এক নতুন কাব্যভাষার জন্ম দিল। অসমিয়া কবিতার আধুনিক যুগের সূচনা উক্ত পত্রিকার সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই ঘটে। কলকাতায় অধ্যয়নরত জাতীয় ভাবনায় উদ্‌বুদ্ধ কয়েকজন ছাত্রের উদ্যোগের ফসল ছিল এই পত্রিকা। তবে এটির দিক-নির্ণায়কের ভূমিকায় ছিলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা ও হেমচন্দ্র

গোস্বামী। নিজের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে 'জোনাকী' শুরুতেই প্রত্যক্ষ ভাষা পরিত্যাগ করে উৎপ্রেক্ষার (মেটাফোর) আশ্রয় নিয়েছিল এ-রকম বক্তব্যে — আমরা সংগ্রামে নেমেছি 'অন্ধকার'-এর বিপক্ষে : উদ্দেশ্য— দেশের উন্নতি 'জোনাক'। জোনাকীর আত্মকথা এভাবে 'অন্ধকার' ও 'জোনাক' (আলো) শব্দ দুটি ঊর্ধ্বকমার মধ্যে প্রয়োগে বাচ্যার্থের ঊর্ধ্বে উঠে অর্থগত ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। 'জোনাকী' নিজের উদ্দেশ্য 'দেশের উন্নতি' বলে উল্লেখ করায় কথাটির মধ্যে ভাষার উন্নতির উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান। স্মর্তব্য যে, জোনাকী 'রাজনীতি'কে তার 'রাজ্য'-এর বাইরে রাখার কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিল। পত্রিকায় সাহিত্যের নান্দনিক যাত্রা নতুন করে সৃষ্ট অসমিয়া মধ্যবিত্তের জাতীয় মর্যাদা রক্ষার যাত্রার সমান্তরাল হয়ে পড়ে। পশ্চিমি উদারতান্ত্রিক মানবতাবাদের হাওয়ার শিহরনে রাজনৈতিক পরাধীনতার কথাটি গৌণ হয়ে পড়েছিল। কারণ তাদের মানসভূমি অন্য এক স্বাধীনতার অনুভূতি লাভ করেছিল— এ এক বদ্ধ জীবনচর্চা থেকে বেরিয়ে এসে জ্ঞানের এক নতুন দিগন্তে মনের উন্মুক্ত বিচরণ-চেতনা। নব-বৈষ্ণববাদের ভক্তির স্রোতে অসমিয়া সম্প্রদায়ের মনোলোকে জীব ও আত্মার মধ্যে সম্পর্ক সন্ধানের মাধ্যমে ইতিমধ্যে এক উদারতাবোধ ও সমতাবোধের বীজ গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল ঈশ্বরসন্ধানী দর্শনের মধ্য দিয়ে আগত আধ্যাত্মিক স্তর। সেখানে 'মুক্তিতে নিস্পৃহ' ভক্তের উপাস্য দেবতার মাধ্যমে নির্গুণ ব্রহ্মকে নারায়ণ রূপে আত্মার ভিতরে উপলব্ধির প্রয়াস ছিল। কিন্তু তাতে ব্যক্তিমনের আবিষ্কার ছিল না। ঈশ্বরকেন্দ্রিক দর্শনে এর প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু পশ্চিমি প্রজ্ঞার বাতাবরণে মানবতাবাদের দর্শনের সঙ্গে এইসব ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে নিবদ্ধ মনের সাক্ষাৎ ঘটে। তার উদারতান্ত্রিকতা ছিল মানবকেন্দ্রিক উদারতা— মানুষের সৌন্দর্য, সামর্থ্য, শৌর্য-বীর্য রেনেসাঁস থেকেই পশ্চিমি জ্ঞান ও দর্শনের কেন্দ্রীয় অন্বেষণের বিষয়। অবশ্য তার সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতিতে রোমান্টিক কল্পনা গুরুত্ব পাওয়ার আগেই মানুষের বহির্জীবন, সমাজ ও বহিঃপ্রকৃতির ক্রিয়াকাণ্ডের দিকটিই প্রধানত প্রতিভাত হয়েছিল। রোমান্টিকতার ধারণার মধ্য দিয়েই এই পশ্চিমি ভাবনায় প্রভাবিত মন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। প্রকৃতিপ্রদত্ত বিশ্বজগৎ যে কল্পনার আলোয় নতুন করে আবিষ্কার করা যায় কিংবা বৈষয়িক অন্বেষণের ফলে হওয়া ক্রিয়াকাণ্ডে যে জাগতিক বিপর্যয় ঘটে তা রোধ করে কল্পনাশক্তির দ্বারা জগৎকে রূপান্তর করা যায় এবং এমন-কি বৈপ্লবিক পরিবর্তনও আনা সম্ভব— এ-রকম ধারণা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল। রোমান্টিকতার এই যুগটিতে কল্পনাপ্রতিভার সৃষ্টিশীলতা শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনোযাত্রার প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে।

'জোনাকী'-র কবিদের মনে পশ্চিমি রেনেসাঁসের মানবতাবাদ ও রোমান্টিক কল্পনা বাহিত মনোমুক্তি— এই দুয়েরই প্রভাব পড়েছিল। এর আগে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র-পত্রিকাগুলি অসমিয়া ভাষাকে এক আধুনিক রূপ দিয়ে সুস্থির অবস্থায় এনেছিল। উপযুক্ত একটি ভাষার মাধ্যমে কল্পনাশক্তির ধারণা নতুন পথ খুঁজে পাওয়ায় রোমান্টিক অসমিয়া কবিতার ধারা 'জোনাকী'-তে শুরু হয়ে গেল।

'জোনাকী'-র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার 'বনকুঅরী' কবিতাটি কাব্যজগতে যে-নতুন স্পন্দন সৃষ্টি করল তার প্রতি সাড়া দিয়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর জীবনস্মৃতিতে কবিতাটিকে 'অসমিয়া ভাষায় বর্তমান কালের উপযোগী সুমধুর কবিতা' (শুঅলা কবিতা) বলে মত প্রকাশ করেন। তদুপরি বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি poem শব্দটি ব্যবহার করে এই অসমিয়া কবিতাটি যে ইংরেজি poem ধরনের সেটিও সকলকে জানানোর চেষ্টা করলেন। এই মন্তব্যে 'বর্তমানের কবিতা' যে 'পৌরাণিক পদ্য' থেকে পৃথক তা দেখানোর প্রয়াস ছিল। বেজবরুয়ার জীবনস্মৃতিতে জনাকয় রোমান্টিক ইংরেজ কবির নাম প্রসঙ্গক্রমে এসেছে এবং এ-কথাও উল্লেখ আছে যে, রোমান্টিক কবিতার গীতিময়তা প্রকাশের স্বাদ সেই সময়ে কলকাতায় পাঠরত অসমিয়া ছাত্ররা পেয়েছিল পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত 'গোল্ডেন ট্রেজারি'-র কবিতাগুলো থেকে। অসমিয়া রোমান্টিক কবিতায় তাই Golden Treasury-র প্রভাব ব্যাপক। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে আধুনিকতাবাদী পর্ব শুরু হওয়ার পরেও পলগ্রেভ-এর 'গোল্ডেন ট্রেজারি' ইংরেজি পাঠক্রমের অঙ্গ হিসাবে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণিতে পড়ানো হত। সম্ভবত অসমিয়া আধুনিকতাবাদী কবিদের, টি. এস. এলিয়টের প্রভাব সত্ত্বেও,

রোমান্টিক মেজাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না-হওয়ার এটাও একটা কারণ।

অসমিয়া কবিতা ষোড়শ শতকের নব-বৈষ্ণববাদের ভিত্তিতে ভক্তিকেন্দ্রিকতার মাধ্যমে যে-রূপ নিয়েছিল তার পদলালিত্য এসেছিল কয়েকটি বিশেষ ছন্দোবন্ধের মধ্য দিয়ে, কিন্তু তার ভাববস্তু সমসাময়িক লৌকিক সংস্কৃতির জগৎ থেকে নয়। তা এসেছিল ভক্তিকে প্রগাঢ় করে তুলতে সক্ষম কয়েকটি পুরাণ থেকে— যার মধ্যে ভাগবত-এর অবদানই ছিল সর্বাধিক এবং তার পরের স্থানে ছিল রামায়ণ। ওইসব কাব্যসাহিত্যে সমসাময়িক জনগণের আধ্যাত্মিক জীবন সুস্থির করার প্রয়োজন এবং একেশ্বর সাধনই ছিল প্রধান। মনটিকে আধ্যাত্মিকভাবে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করার সময় ব্যক্তিমনের স্বতন্ত্রতা প্রকাশের সম্ভাবনা সেখানে ছিল না। আধুনিক যুগের অসমিয়া কবিতা রোমান্টিকতার সংস্পর্শে আসার কালেও সমাজজীবনে আধ্যাত্মিক ভাবনার স্রোত বয়ে চলছিল। 'হরি নাম রসে বৈকুণ্ঠ প্রকাশে বহে অমৃতর ধারা' এখনও অসমের নামঘরে-ঘরে মুখরিত হয়ে অসমিয়া সমাজমানসের একটি স্তরে আধ্যাত্মিক ঢেউ তোলে। এতে কোনো ব্যাঘাত না-ঘটিয়েই উনিশ শতকের শেষভাগে রোমান্টিক ভাবাদর্শ অসমিয়া কাব্যজগতে প্রবেশ করে। 'জোনাকী' থেকে 'বিজুলি', 'উষা', 'বাঁহী', 'সুরভি' ও 'আবাহন' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এই ভাবাদর্শের একটি ধারা চল্লিশের দশক পর্যন্ত সজীব হয়ে রইল।

চন্দ্রকুমারের 'বনকুঅরী' কবিতায় রোমান্টিকতার যথেষ্ট লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এর আগে নব-বৈষ্ণব যুগের অসমিয়া কবিতায় যে-প্রকৃতিকে পাই সেই প্রকৃতি মানব মনের অভিঘাতের বহির্ভূত এক জড় প্রকৃতি। কিন্তু 'বনকুঅরী'-তে প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল এক প্রাণময় অস্তিত্ব— যা কবিকল্পনার এক জীবন্ত জগৎ। তার প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে যে-ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়েছে সেগুলি হৃদয়ের অনুভূতি সঞ্জাত। সেখানে 'নিচুক লতিকা' গাছকে 'সাবটে' (জড়িয়ে) ধরে কুলুকুলু স্বরে 'কথা কয়', ঝরঝর করে বোবা বাতাস পাতায় পাতায় কী যেন 'ফুচফুচায়' (ফিসফিসায়), একজোড়া কপোত একে অন্যকে 'মরম যাচে' (আদর করে), চঞ্চল বায়ুতে 'নোম শিয়রে' (রোম খাড়া হয়)। এখানে প্রকৃতি ও অতিপ্রাকৃত (supernatural)-এর সমন্বয় ঘটে। অর্থাৎ কবির রহস্য সন্ধানী কল্পনা বহিঃপ্রকৃতিকে এক প্রাণময় অস্তিত্বে রূপান্তরিত করে। এভাবেই রোমান্টিকতার স্পর্শ লেগে কবির দৃষ্টি জীবনের বৈষয়িক অংশ থেকে অন্তর্ভূমিতে প্রবেশ করে এবং এক অন্তর্বিশ্ব আবিষ্কার করে। এই অন্তর্বিশ্ব থেকে বহির্বিশ্ব পর্যন্ত পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়ে বিষয়কে অতিক্রম করে বাইরের জগতেও এক প্রাণময় জগতের সন্ধান পেতে শুরু করে।

ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ ও কোলরিজ উভয়েই কল্পনাশক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তবে কোলরিজ সৃজনশীল কল্পনা ও সাধারণ কল্পনার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে কবিকল্পনাকে এক সৃজনীশক্তি হিসেবে দেখিয়েছিলেন। এটি কল্পনার দ্বিতীয় স্তর মাত্র। প্রথম স্তরের সাধারণ কল্পনা পর্যন্ত আগত উপলব্ধিকে এই দ্বিতীয় স্তরের কল্পনা তার সৃষ্টিশীলতায় মন্থন করে কবিতার উপাদানে পরিণত করে। ফলে রোমান্টিক ধারণায় কবি হয়ে পড়েন স্রষ্টা, মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী এক প্রতিভাধর। এই তাত্ত্বিক ধারণাগুলি নিশ্চয় এভাবে তখনকার অসমিয়া কবিদের মনে আসেনি। কিন্তু রোমান্টিক চিন্তাচর্চার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট ইংরেজি কবিতার সংস্পর্শে এসে তাঁরাও মনের মধ্যে কল্পনাশক্তির উপস্থিতি উপলব্ধি করেছিলেন এবং তা রূপান্তর করার শক্তির দ্বারা জগতের মধ্যে ব্যক্তিমনের প্রক্ষেপ ঘটিয়েছিলেন। কবি উইলিয়াম ব্লেক বাহ্যিক দৃষ্টির (corporal or vegetative eye) কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনি এর সাহায্যে দেখা ছাড়াও এর ভিতর দিয়ে দেখেন (I look through it and with it)— এ-রকম দু-ধরনের দৃষ্টি অসমিয়া রোমান্টিক কবির কল্পনার মধ্যেও ছিল। রোমান্টিক কবি বৈষয়িক জগৎ থেকে পলায়ন করে স্বপ্নাবেশে নিমগ্ন হয়ে থাকেন বলে অনেকেই ভাবেন— এ-রকম মন্তব্য অতিরঞ্জিত। কল্পনা-প্রতিভার দ্বারা অন্তর ও বাইরের অহরহ আদান-প্রদান ঘটানো এবং কবিতায় তার এক রূপান্তরিত রূপ প্রকাশ করাটা তাঁদের কাম্য। 'বাঁহী' পত্রিকাটির প্রথম বছর চতুর্থ সংখ্যায় কবি যতীন্দ্রনাথ দুঅরার লেখা 'কবিতা' নামক রচনাটি অসমিয়া রোমান্টিক কবির কাব্যাদর্শের একটি আভাস দেয়। তিনি তাতে লিখেছেন— "জগৎ-এর ঘটনা মনের মধ্যে যে-ভাবের উদ্রেক করে, অন্যের মনকে মোহাচ্ছন্ন করার শক্তির দ্বারা সেই ভাবের বিকাশই কবিতা; মন ও কল্পনাই কবিতার সৃষ্টিকর্তা; ভাব তার অঙ্গ, মানবসমাজই বিকাশের স্থল।" — এখানে 'মানবসমাজই বিকাশের স্থল' মন্তব্যটি অর্থপূর্ণ। মানবসমাজে যে-উপাদান রয়েছে তা কল্পনার সৃষ্টিশীলতাকে 'বিকশিত' করে তোলে বলে দুঅরা বলেছিলেন।

কবিতা কী করে, এই কথার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "হৃদয়কে বিস্ময় রসে ডুবিয়ে নির্জীব মনের ভাব সজীব করে প্রিয় প্রাণে শান্তিজল ছিটিয়ে দেয়।"

রহস্যবোধ ও বিস্ময়রস রোমান্টিক কবির বোধে সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। এ-রকম বোধের মধ্য দিয়েই মানবসমাজ সম্পর্কিত দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল। চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার 'বীণ বরাগী' অসমিয়া রোমান্টিক কবিতার একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। কবিতাটিতে মানবতাবাদের আধারে মানবসমাজের সমস্ত অভিব্যক্তিকে নানা ভাবতরঙ্গের ভিতর দিয়ে এবং বিস্ময়ানুভূতির মাধ্যমে অন্তর্গত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। অলিখিত ভাষার জাগতিক অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য রোমান্টিক কবির প্রিয় ভাষিক অবলম্বন হল প্রতীক। 'বীণ বরাগী'-র বরাগী কবিরই প্রতীক। লেখনী তাঁর 'বীণ' এবং কবিতার ভাবতরঙ্গ তার সুরের স্পন্দন। সাধারণ দৃষ্টিকে অতিক্রমকারী এক দিব্যদৃষ্টির কথা কবিতাটিতে বারে বারে এসেছে এবং তাতে 'অন্তরের চকু'-র উল্লেখ রয়েছে।

১) *দিব্য দৃষ্টিরে চোয়াহে জগতখন*
প্রহেলিকা গুচি এয়ে জীবন-রঞ্জন।
(চতুর্থ তরঙ্গ)

(দিব্যদৃষ্টিতে দ্যাখো জগৎখানি
প্রহেলিকা ঘুচে এটাই জীবন-রঞ্জন)

২) *অন্তরর চকু মেলা মোর বন্ধু*
দিব্য দৃষ্টিরে ফুরা
এই দাপোনত শুধু প্রতিবিম্ব
বাহির ভিতর জোরা
(অষ্টম তরঙ্গ)

(অন্তর্দৃষ্টি মেলে ধরো বন্ধু
দিব্যদৃষ্টিতে করো বিচরণ
শুদ্ধ দর্পণে শুধু প্রতিবিম্ব
ভিতরে-বাইরে নিরীক্ষণ)

উল্লিখিত স্তবকটির শেষে আমরা পাই রোমান্টিক কল্পনার এক নিগূঢ় অনুভূতি। যেখানে কবি একজন স্রষ্টা, যাঁর অসাধারণ দৃষ্টি গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে এবং যা হয়ে উঠতে পারে মানবতার কণ্ঠস্বর —

মোরেই মুখেদি মানব-প্রাণর
ফুটক আকুল মাত,
মোর চিন্তাতেই গূঢ় রহস্যর
সত্য হ'ক প্রতিভাত।
(আমারই মুখে মানব-প্রাণের
ফুটুক আকুল স্বর
আমারই চিন্তায় গূঢ় রহস্যের
সত্য হোক প্রতিভাত)

অসমিয়া রোমান্টিক কবিতার অন্বেষণ কোন্ দিকে নির্দেশিত হয়েছিল সে-কথা চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাব যে রোমান্টিক অসমিয়া কবির কাছে সৌন্দর্য সন্ধানই ছিল প্রধান অবলম্বন। এই সৌন্দর্য সন্ধানের একটি মূল ভাব পরিলক্ষিত হয় চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার অন্য একটি কবিতার পঙ্‌ক্তিতে, 'সৌন্দর্যর আরাধনা জীবনর খেল'। সৌন্দর্য-সন্ধানকে একমাত্র অবলম্বন না-বলে আমরা প্রধান বলে উল্লেখ করেছি এ-কারণেই যে, অসমিয়া রোমান্টিক কবিতায় নানা অভিব্যক্তি ও অন্বেষণ আছে, যেমন— দেশপ্রেম, নারী-পুরুষের ভালোবাসা, অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতার সন্ধান, বিষাদ, নৈরাশ্য, ভয়ংকরের প্রতি আকর্ষণ, প্রকৃতিপ্রেম, মানববন্দনা ইত্যাদি। কিন্তু প্রায় সবক্ষেত্রে কবিদৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সৌন্দর্যস্পৃহা এবং এই স্পৃহার ভিতর দিয়েই উঠে এসেছে নানা ধরনের ভাবতরঙ্গ। এই সৌন্দর্যস্পৃহা এক দার্শনিক আধার হয়ে সমস্ত অভিব্যক্তির অন্তরালে আলোড়িত হয়ে চলেছে।

চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার উল্লিখিত কবিতার 'সুন্দরর আরাধনা জীবনর খেল' (সৌন্দর্যের আরাধনা জীবনের খেলা) কথাটির 'আরাধনা' শব্দটি প্রণিধানযোগ্য। মানুষের আধ্যাত্মিক অন্বেষণে যেখানে ছিল ঈশ্বরের আরাধনা, সেই স্থানে উপাস্য দেবতাকে স্থানান্তরিত করে নিয়ে এল রোমান্টিক সৌন্দর্য (কিট্‌স-এর beauty/truth-এর প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়)। বাগ্মীবর নীলমণি ফুকন (বড়) 'সুন্দর তুমি ক'ত' বলে আজীবন সুন্দরকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, কিন্তু এই সৌন্দর্যস্পৃহা তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয় চেতনাকে নির্বাপিত করতে পারেনি। নলিনীবালা দেবী 'অসীম সৌন্দর্য-তৃষ্ণা'-র কথা বলেছিলেন এবং এই সৌন্দর্য-তৃষ্ণা যে রূপতৃষ্ণা (quest for form) এবং সুন্দর যে চিরসুন্দর (অতীন্দ্রিয় transcendent) তার আভাসও দিয়েছেন এভাবে—

'মানুহর দু চকুর অসীম সৌন্দর্য-তৃষ্ণা
সুখ-আশা, হেঁপাহ বুকুর,
নহয় ই মরতর ক্ষন্তেকীয়া জীবনর
সুখ-আশা পরমপদর
রূপতৃষ্ণা চির সুন্দরর।'

(মানুষের দু-চোখের অসীম সৌন্দর্য-তৃষ্ণা
সুখ-আশা, আকাঙ্ক্ষা বুকের,
নয়তো এ মর্তের ক্ষণিক জীবনের
সুখ-আশা পরমপদের
রূপতৃষ্ণা চিরসুন্দরের)

এখানে পরমপদ (আধ্যাত্মিক আরাধ্য ঈশ্বর)-কে স্থানান্তরিত করেছে 'চিরসুন্দর'। সেকুলার অন্বেষণে আধ্যাত্মিক অন্বেষণ মিশ্রিত হয়ে গেছে। সূর্যকুমার ভূঞার 'আপোন সুর'-এ এসেছে অনন্তের ধারণা এবং সেখানেও কিট্‌স-এর truth/beauty কথাটির প্রতিধ্বনি রয়েছে।

'সত্য যি সুন্দর যার অনন্ত যৌবন
তারেই বুকুত মই পাতিম কানন।'
(সত্য যে সুন্দর যার অনন্ত যৌবন
তারই বুকে আমি গড়ব কানন।)

অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর সৌন্দর্য-অন্বেষণ ভূমা স্পর্শ করেছে। কবিপ্রাণে এক সৌন্দর্য-প্রতিমা নির্মাণ করেছে, এই প্রতিমা তাঁর 'রাণী'। রানির বুকে বেল-বকুলের গন্ধ 'বিচার করি' (সন্ধান করে) আকাশের দিকে চেয়ে অন্ধকারের অতল তলে চলে যেতেও কবি প্রস্তুত— এই আকাঙ্ক্ষা সীমাকে অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা। অম্বিকাগিরির অসীম সৌন্দর্যতৃষ্ণা পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষণ দেখায় না, কেবল এই অন্বেষণেই লাভ করে নান্দনিক পরিতৃপ্তি।

'আদ্যন্তহীন চুমা অভিযান' কবিতায় কবি বলেছেন

'উন্মাদী চুমারে মই আছো আগুয়াই—
রাণীয়ে নিদিয়ে ধরা— আছে পিছুয়াই—
ইদরে অনন্তকাল ওঁঠ দুটি মোর
চুমালৈ রাণীকে খেদিছে— নাই ওর—'
(উন্মাদী চুম্বন নিয়ে আমি গেছি এগিয়ে
রানি তো দেয়নি ধরা— রয়েছে পিছিয়ে
এভাবে অনন্তকাল ঠোঁট দুটি মোর
চুম্বন নিয়ে ধেয়েছে রানিকে— নেই শেষ)

অম্বিকাগিরির কবিতার এই সৌন্দর্যতৃষ্ণা পরবর্তী সময়ে রূপান্তরিত হয়েছে মানবীয় অন্বেষণের বৌদ্ধিক অভিযানে। কবি 'স্তব্ধ, নিবিড়, নিবিড় নিমাত/অজানা উলাহ এটি অতিপাত/অতল হিয়ার উপচাই পার/আকুল বিকুল হৈ' ওঠার পর দেখতে পেয়েছেন বজ্রকঠোর দুঃখবেদনা, 'নির্যাতনর ঘোর ঘরিষণ লগা' জীবনে 'মত্ত, মহৎ, কালবিজয়ী রুদ্র লীলার ভমক ভেদা অনল' এবং তার মধ্য দিয়ে সেই জীবনে তাচ্ছিল্য, অপমান, অবজ্ঞার যন্ত্রণা পেয়েও 'মুক্ত মাণিক জ্বলে'।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, অসমিয়া কবি যে-দৃষ্টিতে অসীম-রূপ অন্বেষণ করেছিলেন, সেই দৃষ্টি অসমিয়া পৌরাণিক কবিতার কবিদৃষ্টি থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার নয়। এই দৃষ্টি এসেছিল পাশ্চাত্য দৃষ্টির সংযোগ থেকে। তবে সেখানে রোমান্টিক উপাদানের সঙ্গে মিলন ঘটেছিল ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তা থেকে উদ্ভূত অতীন্দ্রিয় উপাদানের। অসমিয়া লোকসাহিত্যেও (মৌখিক) গীতিময়তার একটা স্তর বহু যুগ থেকেই বহমান ছিল। এই স্তরের স্পন্দনও রোমান্টিক কাব্যদৃষ্টিতে মিশে গিয়েছিল।

অম্বিকাগিরির রোমান্টিক মনই কেবল জীবনের ক্ষুদ্র জাগতিক অঞ্চল থেকে ভূমাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেনি, অন্যান্য কবিদের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছিল। পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া একদিকে প্রকৃতির কবি, অন্যদিকে লোকসংগীতেও স্পন্দিত তাঁর মন। তাঁর মনের মধ্যে বিহুগীত, বনঘোষার মধুর সুর ঘুরপাক খেত, যেখানে গীতিময় ছন্দ প্রকৃতির উপাদানের স্পর্শে আলোড়িত হয়ে উঠত। কিন্তু পার্বতীপ্রসাদের 'বীণ বরাগী' কবিতার বৈরাগী 'চির অভেদ্য মহা রহস্য'-এর ওপারে 'মহাজীবন'-এর দীপকেও অন্বেষণ করেছিল। এখানেও সীমা অতিক্রম করার প্রচেষ্টা লক্ষ করি আমরা। পার্বতীপ্রসাদের 'বীণ বরাগী' চন্দ্রকুমারের 'বীণ বরাগী'-র দ্বারা প্রভাবিত। অবশ্য চন্দ্রকুমারের বীণ বরাগীর মতো পার্বতীপ্রসাদের বীণার ঝংকার বিবিধ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত বলা যায় না। চন্দ্রকুমার নিজে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'বীণ বরাগী' কবিতা থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার বীণ বরাগী মানুষের মহত্তর মানবতাবাদের মধ্যে তার অন্বেষণ করেনি। এই বৈরাগী বা বাউল জাতীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে অতীত-গৌরবের পুনঃসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেছিল। কিন্তু এই অন্বেষণের শেষ পর্যায়ে বীণ বরাগী 'আকাশী রস'-এর সুধার সন্ধানে এক রোমান্টিক স্বর্গে উপনীত হয়েছিল এবং কল্পনার দ্বারা জগৎটিতে রূপান্তর আনার কথা বলেছিল—

'নতুন প্রাণর ন চকুজুরি
দীপিতি ঢালি দে তাত,
পুরণি পৃথিবী
নকৈ চাই লও
হে বীণ এযারি মাত।'
(নতুন প্রাণের নতুন দৃষ্টিতে
দীপ্তি ঢেলে দে সেথা

পুরনো পৃথিবী
দেখে নিই নব সাজে
হে বীণা, বাজো একটু হেথা।)

এই কবিতার বীণ অসমের জাতীয় গৌরবের স্মৃতি থেকে জীবনের আনন্দ সন্ধান করে পুরনো পৃথিবীকে নতুন করে গড়ার যে-প্রয়াস করেছিল তার মধ্য দিয়ে 'বীণ'টি সৃষ্টিশীল কল্পনার এক প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

অসমিয়া অন্যান্য কবির কল্পনার সৃজনীশক্তিও হৃদয়ের আবেগকে সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করেছিল এবং কবিকে সসীমের সীমা অতিক্রম করে অসীমের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় উৎসাহ জুগিয়েছিল। শেলির 'মেডুসা' কবিতার প্রতিধ্বনি লক্ষ করা যায় রঘুনাথ চৌধারীর একটি কবিতায়। এটি প্রত্যক্ষ প্রতিধ্বনি নয়। চৌধারীর 'ফুলশয্যা' কবিতায় ধ্বংসের ভয়াবহ রূপকে সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে— যেন এই কল্পনায় ভীষণতাও সুন্দরেরই এক বিপ্রতীপ রূপ—

'জ্বলিছে দূরত সৌ প্রলয়র শিখা
ধরিছে কি রূপ বিতোপন।
সেয়ে মোর ফুলশয্যা রক্তকমলর
লম তাত অনন্ত শয়ন।'
(জ্বলছে দূরে ওই প্রলয়ের শিখা
ধরেছে কী রূপ শোভন।
সেই মোর ফুলশয্যা রক্তকমলের
নেব সেথা অনন্ত শয়ন।)

এখানে 'অনন্ত শয়ন' কথাটির দ্বারা মৃত্যুর মধ্যে অমরত্বের ধারণাটি যেন জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

রত্নকান্ত কাকতীর 'সুন্দরর আহ্বান'-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

'আজি নাজানো কোনে মাতিছে মোক
মেঘর লগত যাবলৈ।'
(জানি না আজ কে ডাকে মোরে
মেঘের সঙ্গে যেতে।)

এই অজানা আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে কবিপ্রাণ সীমা থেকে অসীমের উদ্দেশে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন—

'আজি উরিম মাথোন মেঘর লগত
নীলিম গগন বিচারি
পূবে পশ্চিমে যেনিবা পাওঁ
মধুর বাঁহীর সহাঁরি'
(আজ উড়ব কেবল মেঘের সঙ্গে
নীল আকাশের খোঁজে
পুবে-পশ্চিমে যদি-বা পাই
মধুর বাঁশির উত্তর)

'মধুর বাঁহী' (মধুর বাঁশি) কথাটি মনে করিয়ে দেয় রোমান্টিক পর্যায়ের আধুনিকতার কালে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাটি, যার নামও 'বাঁহী'। ওই নামটিই যেন রোমান্টিক কবিতার মধুরতা-সন্ধানী এক প্রতীক।

রোমান্টিক বিষাদ যতীন্দ্রনাথ দুঅরার কবিতায় অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে চলেছে। এই বিষাদ মধুরতার আকর্ষণ থেকে দূরে নয়। সুন্দরের সোনালি দেশের অন্বেষণে এই বিষাদের উৎপত্তি এবং এই সোনালি দেশ হল আদর্শ সৌন্দর্যের নামান্তর। যতীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় কবির প্রতীক হিসেবে কল্পনা করেছেন একজন মাঝিকে (রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'-র মাঝির মতো নয়)। জীবনের যাত্রাপথের গোধূলি লগ্নে আমরা মাঝির দেখা পাই এবং এই যাত্রা সর্বদাই ভাটির দিকে যাত্রা। নতুবা এই যাত্রা দৃশ্যমান প্রকৃতিতে যে-তীর দেখা যায় তার থেকে দূরে রহস্যের আবর্তে অবস্থিত অপর এক তীরের উদ্দেশে যাত্রা, আর সে-কারণেই এ-যাত্রা অন্য এক আকর্ষণ। ইন্দ্রিয়গোচর ও ইন্দ্রিয়াতীতের সংযোগের মাধ্যম তরীটিকে এক অর্থে আমরা কবিকল্পনার প্রতীক হিসেবে ধরে নিতে পারি। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ সমস্ত বিষাদ অতিক্রম করে মাটির পৃথিবীতে তাঁর দৃষ্টি একসময় ফিরিয়ে এনেছিলেন। 'এই ধরণীর প্রতি ধূলিকণে সোণর সরগ রচে, মরণবিজয়ী প্রেমর সুরত অমৃত উঠলি পরে।' এ-রকম সৌন্দর্যবোধ তাঁর কবিতায় বিষাদবোধকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল।

রোমান্টিক কবিতার শেষ যুগে আবির্ভূত হয়ে দেবকান্ত বরুয়া সম্ভবত তাঁর পূর্বসূরিদের কল্পনার অসীম যাত্রাকে, আনন্দের অশরীরী শিহরনকে কিংবা সৌন্দর্য সন্ধানের গগনচুম্বী প্রয়াসকে ভোক্তা পুরুষের দৃষ্টিতে মর্তে রক্তমাংসের শরীরী জগতে নামিয়ে এনেছিলেন। সেখানে বিভিন্ন রূপে নারী এসেছিল কেবল নীরব শ্রোতার ভূমিকায়। কারণ সেই নারীর অস্তিত্ব ঘোষিত হয়েছিল কবিতার এককথনের গাঁথনির ভিতর দিয়ে। কবি সসীমকে রূপান্তর করেননি, বরং অসীমের প্রতিরূপ খুঁজেছেন সসীমের মধ্যে। 'কলঙ পারর এই দুঅরীত আকাশর বিচারো তুলনা।'

(কলংপারের এই দুয়ারে আকাশের তুলনা খুঁজি) কিন্তু তাই বলে কবি অ-রোমান্টিক নন। তাঁরও ছন্দের তুলি 'অশ্রুক্লান্ত জীবন'-এর সোনালি ছবিই আঁকে। দৃশ্যমান জগতের প্রকৃতির কোলে ফুল ও প্রজাপতির চুম্বনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন প্রেমের রূপ। তাঁর কবিতায় দেখা মেলে ট্র্যাজিক চেতনারও। 'দেবদাসী' কবিতায় নিয়তির বিরুদ্ধে মানুষের অক্ষয় সংগ্রামের প্রবক্তা তিনি। তাঁর বিশ্বরূপ দর্শনে নিয়তির জয় নিশ্চিত রূপে দেখা গেলেও মানুষের শৌর্য-বীর্যের কথাও উল্লেখিত। এই শৌর্য-বীর্যের কীর্তিস্তম্ভ কবি, কারণ মানুষের এই অক্ষয় সংগ্রামের চিরন্তন শিল্পিত রূপ তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে উদ্ভাসিত।

এই রোমান্টিক কবিতার যুগের অবসান সূচিত হল বিশ শতকের চল্লিশের দশকে। প্রথমে প্রগতিবাদী কবিতায় শ্রেণিচেতনা সমাজমুখী দৃষ্টি আনার ফলস্বরূপ এবং দ্বিতীয়ত ভাববাদী চিন্তায় বৌদ্ধিকতা আবেগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে না-দেওয়ায় উদ্ভূত কাব্যরীতির ফলে।

।। দুই ।।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে অসমিয়া কবিতায় এক নতুন ধারার সূচনা লক্ষ করা যায়। এই সময়ে অসমিয়া কবিতায় রোমান্টিক ভাবধারার গতি দুর্বল হয়ে পড়ে, ভাববস্তুর চর্বিতচর্বণ ছাড়া ভাষাও ভঙ্গিসর্বস্ব হয়ে পড়ে। জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে কবিসত্তার সংযোগ ছিন্ন হতে থাকে। এ-রকম একটি পরিবেশে 'জয়ন্তী' পত্রিকার পাতায় অসমিয়া কবিতার এক নতুন ধারার সূচনা হয়। 'জয়ন্তী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন রঘুনাথ চৌধারী। তিনি অসমিয়া রোমান্টিক কাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তবে ১৯৪৩ সালে তিনি 'জয়ন্তী'-র সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর পত্রিকার দায়িত্বভার নিলেন মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার দুই লেখক— কমল নারায়ণ দেব ও চক্রেশ্বর ভট্টাচার্য। ১৮৮৯ সালটিকে যদি অসমিয়া রোমান্টিক কবিতার সূচনার বছর হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে ১৯৪৩ সালকে প্রগতিশীল বা প্রগতিবাদী কবিতার সূচনার বছর হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। 'জোনাকী'-তে বহুল ব্যবহৃত শব্দটি ছিল 'উন্নতি' (শ্রীবৃদ্ধি) এবং শব্দটির মধ্যে উপ্ত ছিল জাতীয় উন্নতির অনুভব। সেই সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে গড়ে-ওঠা অসমিয়া বিদ্বৎ সমাজ এক রাজনীতি-নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে ভাষা-সাহিত্যের উন্নতিকেই প্রধান কর্তব্য বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে ওই মধ্যবিত্তদের একাংশ ভাষিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস চালান। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ও বিনন্দ চন্দ্র বরুয়ার কবিতায় তার সন্ধান মেলে। অবশ্য অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীও অসমিয়া জাতীয়তাকে ভারতীয় মহাজাতীয়তার অঙ্গ বলে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ অসমিয়া ভাষাগত জাতীয়তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি ভারতীয় মহাজাতীয়তার মধ্যে সেটিকে 'বিশিষ্ট ভাবে' তুলে ধরেছিলেন। তাঁর রচনায় ভারতীয় মহাজাতীয়তাকে বিশ্বমানবতার সঙ্গে সংযোগের প্রচেষ্টাও আমরা লক্ষ করি। রোমান্টিক কবিমানস থেকে যে-ভাবধারা সমাজজীবনে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল সেখানে জাতীয় চেতনার প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। এই জাতীয় চেতনা থেকে সমাজজীবন নিরীক্ষণ করতে গিয়ে অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভাজন তাঁদের চোখে তেমন করে ধরা পড়েনি। তবে প্রসন্নলাল চৌধুরীর কবিতা এর ব্যতিক্রম বলা যায়। তাঁর কবিতায় রোমান্টিক ভাবধারার মধ্যে মানুষের দুটি রাজনৈতিক শ্রেণি নিরূপণের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই শ্রেণির একটি দল "মত্ত দানব দল/করে হানাহানি/আপোনা আপুনি/কাটে মানুহর গল/মত্ত মানব দল" এবং অপর দলটি হল, "জ্যোতি-সূর্য্য পরশত যার/জীবন প্রভাত হ'ল/অনিয়ম-ভয় করিলে বিজয়/নতুন মানুহর দল"। — এ-রকম আদর্শবাদী বিভাজনকে কিন্তু প্রগতিবাদী কবিতা বলে ধরা যায় না। এখানে উৎপাদনের সরঞ্জামের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বিভাজিত দুটি শ্রেণি আমরা প্রত্যক্ষ করি না। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক প্রগতির ধারণার চেয়ে সেখানে রোমান্টিক আদর্শবাদ ও রোমান্টিক বিদ্রোহের ভাবই বেশি প্রকট।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রোমান্টিকতার ভাববাদ থেকে আগত 'উন্নতি' ও বস্তুবাদের দর্শন থেকে উঠে-আসা 'উন্নতি' ও 'প্রগতি' শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য বিশাল। 'জয়ন্তী' পত্রিকার সপ্তম বছরে দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৯৪৫) কমলনারায়ণ দেব 'সত্যকাম' ছদ্মনামে লেখা একটি প্রবন্ধে 'প্রগতি'-র ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে— "প্রতিক্রিয়া পরাগতিকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার নামই প্রগতি, জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্বের অবিরাম লীলা চলছে।... এই দ্বন্দ্বমূলক বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালো করে বুঝতে হলে তার দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার নিতান্ত প্রয়োজন।" স্মর্তব্য যে, 'প্রগতিশীলতা'কে তিনি সাহিত্যের স্থায়ী বিশেষণ বলে উল্লেখ করেছিলেন, কেবল

সমসাময়িক সাহিত্যে 'তার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।' কমলনারায়ণ দেব তাঁর 'প্রগতিশীল সাহিত্যের ভূমিকা' নামক প্রবন্ধে 'উন্নতি'-র ধারণা ও দ্বন্দ্ববাদী প্রগতির মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন। কমলনারায়ণ দেব কিংবা চক্রেশ্বর ভট্টাচার্য জাতীয় চেতনার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেননি (তৎকালীন প্রগতিবাদী ভাবধারার সাহিত্যিক বা চিন্তাবিদদের অধিকাংশই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন), কারণ ঔপনিবেশিকতাবাদকে ধনতান্ত্রিকদের শোষণের অন্যতম হাতিয়ার বলে চিহ্নিত করার জন্য জাতীয় আন্দোলনও দ্বন্দ্বাত্মক প্রগতির একটি স্তর বলে ধরা হয়েছিল।

মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে আধার হিসাবে গ্রহণ করার জন্য প্রগতিবাদী কবিতার সৃজনক্ষেত্র ছিল সমাজ-বাস্তবতা, যেখানে শ্রেণিবৈষম্যের রূপ ধরা পড়েছিল। প্রগতিবাদী কবিকুল রোমান্টিক কল্পিত আদর্শের জগৎটিকে ভাববিলাসী বলে নিরূপণ করেছিলেন। ওইসব কবিতায় রোমান্টিকদের মতো অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সংযোগের প্রয়াস ছিল না। প্রকৃতি (মানবসমাজকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বস্তু বা প্রাণী) থেকে উপাদান হয়তো রূপক বা প্রতীক হিসাবে আনা হয়েছিল (কয়লা, কুকুর), কিন্তু ধনতান্ত্রিক বুর্জোআ সভ্যতার বর্তমান স্তরটির স্বরূপ উন্মোচন করার প্রয়োজনেই তা এসেছিল, প্রতীকবাদীদের মতো বস্তুজগতের ভিতরের আদর্শজগতের সন্ধানে নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সূত্রগুলি এইসব কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে সন্ধান করাও যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ সার্থক প্রগতিবাদী কবিতাগুলোতে মার্ক্সীয় স্লোগান বা তার দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রচার ছিল না, ছিল সেই দর্শনের ভিতর থেকে উত্থিত শ্রেণিচেতনা কিংবা সমাজবাস্তবতার ধারণার মধ্য দিয়ে আগত উপলব্ধির কাব্যিক প্রকাশ।

প্রগতিবাদী কবিতা 'জয়ন্তী'-র পৃষ্ঠপোষকতায় কেবল আকস্মিক আবির্ভাবের ফসল ছিল না, তার একটি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও ছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন অসমের সমাজজীবন আলোড়িত করার সময় তার জাতীয় চেতনা ভাষিক জাতীয়তাবাদ থেকে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল বলে পূর্বেই বলা হয়েছে। এই জাতীয়তাবাদ অসমিয়া সমাজকে একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেরও সন্ধান দিয়েছিল। আন্দোলনের ব্যাপকতা 'জনতা'র বিপ্লবী চরিত্র ও সম্ভাবনাকে প্রকট করে তুলেছিল। মহাত্মা গাঁধী ভারতীয় ভাবধারায় আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতাকে সংযোজন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আন্দোলন-পদ্ধতি ছিল গণমুখী এবং তা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এক জাগ্রত জনতার রূপ ধরে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এই সময়কালে কংগ্রেসি রাজনীতির মধ্যে মার্ক্সীয় চিন্তার স্রোতও বয়ে চলেছিল। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট তার জন্য আরও সুযোগ করে দিয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার কম্যুনিজ্‌ম পশ্চিমের আগ্রাসী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল আর তার প্রভাব ভারতের নবশিক্ষিত একাংশ তরুণের মধ্যেও পড়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান নেতা জওহরলাল নেহরু মার্ক্সবাদ ও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রগতিমূলক কর্মসূচির প্রতি প্রকাশ্য অনুরাগ দেখিয়েছিলেন। কংগ্রেস দলের ভিতরেও কিছু কিছু যুব-সদস্যের মধ্যে বামপন্থী মতাদর্শের প্রভাব পড়েছিল। এমন-কি নেহরু তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে শামিল করার কথাও চিন্তা করেছিলেন (অবশ্য তিনি মূলত ফোবিয়ান সোস্যালিজ্‌মের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন)। অসমে 'প্রগতিশীল' কবিতার ধারাকে গতিশীল করতে প্রয়াসী কমলনারায়ণ ও চক্রেশ্বরও স্বাধীনতা আন্দোলনের রোমান্টিক বিপ্লবের রূপকে অস্বীকার করেননি। বরং 'সাহিত্যর সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে চক্রেশ্বর ভট্টাচার্য রোমান্টিক কবিদের জনগণের পক্ষে সরব হওয়ার প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম দিককার কবিতাকে 'পলায়নবাদী' বলে মন্তব্য করলেও পরবর্তীকালে রচিত কিছু কবিতার তিনি প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিয়েছে। জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ না-ঘটলে তাঁর মতে সেটা 'শৌখিন মজদুরি' বলে গণ্য হয় এবং তার দ্বারা 'ব্যর্থ হয় জ্ঞানের পসরা।" মহাদেবী বর্মার প্রথম জীবনের 'অতীন্দ্রিয়বাদ' বা 'ছায়াবাদ'-এর তিনি নিন্দা করলেও পরবর্তী সময়ে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া এই কবির প্রশংসা করেন এইভাবে : "(যখন) দেশের হাজার হাজার নরনারী মৃত্যুমুখে পড়েছে, পেটের দায়ে যুবতীরা নিজেদের বিক্রি করছে সেই সময় মহাদেবীরও কবিপ্রাণ না-কেঁদে থাকতে পারেনি।"

প্রগতিবাদী কবিতার চেতনার অগ্রভাগে ছিল জনতা, এবং তাদের মুখে ধ্বনিত হয়েছিল বৈষম্যমূলক শোষণের বিরুদ্ধে

তীব্র নিন্দা। তাদের আস্থা ছিল শ্রেণিসংগ্রামের উপর। তাদের আস্থা ছিল যে দ্বান্দ্বিক প্রগতি সাম্য আনবেই। জনতার বিপ্লবী স্বরূপ প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়েছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে, এবং রাশিয়ায় কম্যুনিজ্‌মের অভ্যুত্থান শোষিত শ্রেণির বিজয়ের সম্ভাবনার আশা জাগিয়েছিল। দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটেই এই চেতনা তখনকার যুবকদলের একাংশকে নাড়া দিয়েছিল এবং এরাই রোমান্টিকতার ভাবাদর্শকে পাশ কাটিয়ে এক ধরনের নতুন কবিতার জন্ম দেয়, যাকে 'প্রগতিশীল' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

কমলনারায়ণ দেব ও চক্রেশ্বর ভট্টাচার্যের পরেই এই ক্ষেত্রে অপর এক মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি হলেন ভবানন্দ দত্ত ('নচিকেতা' ছদ্মনামেও তিনি লিখতেন)। ভবানন্দ তাঁর প্রবন্ধ 'অসমিয়া দার্শনিক'-এ ভারতের কংগ্রেসি আন্দোলনের পথ ধরে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে অসমের দেশসেবকদের মধ্যে সমাজবাদী চিন্তাধারা কেমন করে প্রবেশ করেছে তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন : "কংগ্রেসি আন্দোলনের আদর্শভিত্তি ছিল পাশ্চাত্য থেকে আগত মানবমুক্তি, গণতন্ত্র ও ঐক্যের বার্তা এবং ভারতীয় পরম্পরাগত সংস্কৃতির গৌরববোধ। এই আন্দোলন মহাত্মাজির নেতৃত্বে অহিংস সংগ্রামের পথে ধাবিত হল। এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় দশকে অসমের দেশসেবকদের মধ্যে সমাজবাদী ভাবধারার জন্ম হয়, বিশেষত মার্ক্সবাদ ও রুশ বিপ্লবের প্রেরণার মাধ্যমে। পূর্বতন কংগ্রেসিদের প্রেরণা ছিল ফরাসি বিপ্লব। তরুণ প্রজন্মের প্রেরণা হল বিশেষত রুশ বিপ্লব।"

কংগ্রেসের সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনে দেহ-মনে উৎসর্গিত কবি-নাট্যকার-কথাশিল্পী হলেন জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা। 'জয়ন্তী'-র উদ্দীপ্ত প্রগতিবাদী কবিতার জন্মলাভের আগেই জ্যোতিপ্রসাদ বস্তুবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে তাঁর রোমান্টিক বিশ্ববীক্ষায় নিয়ে আসার জন্য তিনি একদিকে রোমান্টিকতার উত্তরসূরি এবং প্রগতিবাদীর পূর্বসূরি হয়ে পড়েছিলেন। জ্যোতিপ্রসাদ ধনতন্ত্রবাদের সুবিধাভোগের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছিলেন এই বলে যে "সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ এই দুটিই পৃথিবীর ইতিহাসে সংস্কৃতির রূপে দুষ্কৃতিরই পূর্ণরূপ।" (শিল্পীর পৃথিবী) কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের মতো তিনি ছিলেন ঐতিহ্যসন্ধানী। "প্রগতির বৃহৎ ভিত্তি হল ঐতিহ্যের সত্য। আজ আমাদের সংস্কৃতির প্রগতি ভারতবর্ষীয় অসমিয়া ঐতিহ্যের সত্যের ওপর অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।" (শিল্পীর পৃথিবী) এই ঐতিহ্য সন্ধানের মধ্যে এক ধরনের শিকড় সন্ধানের অর্থ নিহিত রয়েছে। তাই বলে জ্যোতিপ্রসাদ ঐতিহ্যের নস্টালজিয়ায় মগ্ন থাকেননি। রূপান্তরের মধ্য দিয়ে জগৎ সুন্দর হয়ে ওঠে— এই উপলব্ধি তাঁর বোধের কেন্দ্রে বিরাজ করত। 'সৌ আকাশত নীহারিকা উরে' (ওই আকাশে নীহারিকা ওড়ে) নামক কবিতাটির মূল তাৎপর্য সেটাই — এ-কথা আমরা ধরে নিতে পারি। নীহারিকার আকারহীন জ্যোতিঃপুঞ্জের শক্তিই 'কত জীবন কত রূপর/কত গুণর/বর্ণগন্ধ গানর সুর'-এর রূপ নেওয়ার জন্য বিশ্বভুবন সফরের কথা তিনি বলেছিলেন। সৌন্দর্যের এই রূপান্তরের কল্পনা রোমান্টিকতার ভাবাদর্শ থেকে এসেছে। কিন্তু তাঁর কবিতায় বারে বারে এসেছে 'জনতা' —

"নবতম মানবর
জন জীবনর
শিল্পীর য'ত গুণাগঁঠা
দুখীয়াক-সুখীয়াক
নগরীয়া, চহরীয়া, গাওলীয়াক
রনুয়াক, বনুয়াক
হজুয়াক চহুয়াক
মুনিহ তিরোতাক
অভিনব ভাষারে শুনাওঁ।"
(শিল্পীর আলোকযাত্রা)

(নবতম মানবের
জনজীবনের
শিল্পীর যেখানে গৌরবগাথা
দুখী-সুখী
শহর, নগর, গ্রামবাসীকে
যোদ্ধা, কর্মী
শ্রমিক চাষি
পুরুষ-নারী সবাইকে
অভিনব ভাষায় শোনাই।)

জ্যোতিপ্রসাদ জনতার যে-রূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা যেন স্বাধীনতা আন্দোলনে জাগরিত এবং বিপ্লবী সম্ভাবনাময় সর্বস্তরের জনগণের রূপেরই আদল। 'জনতার আহ্বান' কবিতায় তিনি 'প্রবুদ্ধ জনতা'র জয়গান গেয়েছেন এবং আরও গেয়েছেন 'আলোকমন্ত্রপূত মহামানবতন্ত্র'র সুর। এই মানবতার ভিত্তি বৃহৎ হলেও অর্থনৈতিক একটি শ্রেণি হিসাবে জনগণ এখানে

অনুপস্থিত। এখানে মানবতার একটি বিমূর্ত রূপই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তবুও রোমান্টিক কল্পনার সম্পূর্ণ ভাববাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আদর্শলোকের সন্ধান না-করে জ্যোতিপ্রসাদ সমাজবাস্তবতার মধ্যে রূপান্তরের ক্রিয়ার সন্ধান করেছিলেন। এবং সব ধরনের জনতার মধ্যে সাম্য কামনা করেছিলেন।

কমলনারায়ণ দেব ও চক্রেশ্বর ভট্টাচার্যের মতোই ভবানন্দ দত্তও অসমিয়া আধুনিক কবিতাকে ভাববাদী রোমান্টিক কল্পনা থেকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তাত্ত্বিক দর্শনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। অপর দুজনের মতো তিনি কেবল মার্ক্সবাদী সমালোচকই যে ছিলেন তা নয়। ছিলেন একজন প্রকৃতার্থে কবি, যদিও তাঁর রচিত কবিতার সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাঁর যে-সব কবিতাকে প্রগতিবাদীরা 'ভাববিলাসী' ও 'অতীন্দ্রিয়বাদী' বলে মন্তব্য করেছিলেন, রোমান্টিক ধারার সেই কবিতাগুলিতে আবেগ প্রকাশের জন্য ধ্বনিলালিত্যের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রগতিবাদী কবিতা এ-ধরনের প্রচেষ্টা থেকে সচেতনভাবে বেরিয়ে এসেছিল। বাস্তবের রুক্ষতাকে প্রকাশ করতে যেমন শব্দের কোমলতা, নমনীয় ধ্বনিমাধুর্য যথাযথ ছিল না — সে-কারণে ব্যঞ্জনবর্ণের কাঠিন্য বাস্তব জীবনের কাঠিন্যের প্রতিরূপ হয়ে পড়েছিল। এই কবিকুল অসমিয়া কবিতায় একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশশৈলীর মেলবন্ধন ঘটানোর সময় তাঁদের রোমান্টিক ভাবধারার কবিতায় এক অলস অনুকরণপ্রিয়তা লক্ষ করা যায় এবং এঁদের আক্রমণ সামগ্রিকভাবে ভাববাদী কবিতার বিরুদ্ধে হলেও রোমান্টিক কবিতার নিস্তেজ অনুশীলনই তাঁদের বিরুদ্ধে দৃষ্টিভঙ্গিকে বেশি প্রভাবিত করে। তদুপরি অসমের সমাজ-জীবনেও তখন নানা পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। এই সময়ে দালাল, ঠিকাদারদের বেশে সাম্রাজ্যবাদের গোলামি-করা এক সুবিধাবাদী সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হয়। এ-ছাড়া মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব আমজনতার উপর পড়তে শুরু করে। শহরে দিনমজুরের সংখ্যাও বেড়ে যায়। গ্রামে কৃষকরা মহাজনের অর্থনৈতিক কবলে ক্রমাগত শোষিত হচ্ছিল এবং যুদ্ধকালীন অভাব-অনটনের সময় থেকে তাদের উৎপাদন মজুতদারের কবলে বেশি করে যেতে শুরু করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যে-জনজাগরণের জোয়ার দেখা দেয় সেই সময়কালের মধ্যেই এইসব পরিবর্তনের সূচনা হয়। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে তা অধিক প্রকট হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শে বন্দি রোমান্টিকদের চোখে এ-সব ধরা পড়েনি কিংবা সমাজজীবনের এই দিকটির প্রতি তাঁরা উদাসীন ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত একাংশ যুবকের মধ্যে এর প্রভাব পড়ে — তাঁদের একটি অংশ মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন। 'নচিকেতা' ছদ্মনামে ভবানন্দ দত্তের লেখা 'রাজপথ' কবিতাটিতে শ্রেণিশোষণের একটি উদগ্র রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

"বিচিত্র তোমার লীলা,
দুকাষে তোমার দালানর সারি
পাঁচতলার ওপরত শুনা যায় রেডিওর গান
অর্গানত রবীন্দ্রসংগীত,
ডবল দলিচা পরা মেহগনি পালেঙত
বিরহকাতর কলেজগার্লর
অলসায়িত দেহা।
আরু তার তলতেই ফুটপাথত
(ধন্য! তোমার দয়া)
শূন্য ভিক্ষার পাত্র লৈ শুই পরা
মৃতপ্রায় কংকালর সারি।"

(বিচিত্র তোমার লীলা,
দু-পাশে তোমার দালানের সারি
পাঁচতলার ওপরে শোনা যায় রেডিয়োর গান
অর্গানে রবীন্দ্রসংগীত,
ডবল গালিচা পাতা মেহগিনি পালঙ্কে
বিরহকাতর কলেজগার্লের
আলুলায়িত দেহ।
আর তারই নীচে ফুটপাথে
(ধন্য! তোমার দয়া)
শূন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে শয্যাশায়ী
মৃতপ্রায় কঙ্কালের সারি।)

কবিতাটিতে দুটি বিপরীত চিত্রকল্পের সম্মিলিত উপস্থাপনায় ফুটে উঠেছে শ্লেষ ও পরিহাস (irony)। কবিতার নাম 'রাজপথ'— এই নামের মধ্যেই রয়েছে পরিহাস। এক বিশাল রাস্তা— যেখানে 'রাজ' (ঔপনিবেশিক রাজ)-এর অনুষঙ্গও যুক্ত রয়েছে। কিন্তু সেই রাজপথ অর্থনৈতিক বৈষম্যের রূপকের মধ্যে অর্থবহুল হয়ে উঠেছে, রোমান্টিক কবিতার বিষাদবোধ এই কবিতায় নেই। পাশাপাশি কুৎসিতকে সৌন্দর্যের প্রলেপ দিয়ে ঢাকার প্রয়াসও সেখানে নেই। শব্দের ব্যবহারেও ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় না। তার পরিবর্তে বাস্তবের রুক্ষতা প্রতিধ্বনিত করতে কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'কলেজগার্ল'-

এর মতো শব্দ রোমান্টিক শব্দসম্ভারে কোনোভাবেই যথোচিত মনে না-হলেও কবি নগর-চিত্রের এক বিশেষ দৃশ্যের প্রয়োজনে শব্দটির ব্যবহারে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

'জয়ন্তী' পত্রিকাটি প্রগতিবাদী কবিতার গতিপথ নির্ণয় করার দায়িত্ব নেওয়ার বহু আগেই বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী কবি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বস্তুবাদী ভাবধারার কবিতা রচনা করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত তাঁর 'অভিযান' সংকলনে বেশ কয়েকটি সার্থক কবিতার সন্ধান মেলে। 'অভিযান'-এর কয়েকটি কবিতা প্রত্যক্ষভাবে প্রচারধর্মী ছিল এবং তার মধ্যে কয়েকটিতে রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ পেয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ 'পৃথিবীর প্রতি' কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। শিরোনামে রোমান্টিক আহ্বানের একটা সুর খুঁজে পাওয়া যায়। সন্দেহ নেই যে কবিতাটিতে শ্রেণিচেতনা স্পষ্ট, কিন্তু সেখানে 'নর' হয়েছে 'নারায়ণ' এবং সাম্যের বেদিতে 'শান্তির আসন' পাতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের পাশাপাশি 'বরুণ দেবতা' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আবার শাক্তধর্মীয় অনুষঙ্গও এসেছে 'চামুণ্ডার রক্ত রঙ্গ খেলা'-য়। অবশ্য এই কবিতাটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার নিদর্শন নয়। ড. হীরেন গোহাঁই তাঁর কবিতায় কাজি নজরুল ইসলামের ভাষারীতি ও প্রকাশের তেজস্বিতার বিষয়ে বলেছেন। সার্থক কবিতাগুলিতে তিনি নজরুলের রোমান্টিক বিপ্লবী ভঙ্গি থেকে সরে এসেছেন উল্লেখ করে ড. গোহাঁই আরও বলেছেন, 'চহা, গঞা ভাষার লগত একাত্ম হৈছে।' এই কবি বলেছিলেন —

"আমার যি ভাষা হ'ব
সেই ভাষা কেঁয়ে শুনা নাই
আমার যি গান হ'ব
সেই গান কেঁয়ে গোয়া নাই
আমার যি রোষ হ'ব
তেনে বহ্নি কেঁয়ে দেখা নাই।
এই গান নবজীবনর
এই ভাষা নতুন দিনর
এই জুইয়ে পৃথিবীক পুরি নিব ধুই নিব
পৃথিবী উটাই।"

(আমাদের যে-ভাষা হবে
সেই ভাষা শোনে নাই কেউ
আমাদের যে-গান হবে
সেই গান গায়নি তো কেউ
আমাদের যে-রোষ হবে
তেমন বহ্নি কেউ দেখে নাই
এই গান নবজীবনের
এই ভাষা নতুন দিনের
এ-আগুন পৃথিবীকে পুড়িয়ে নেবে ধুয়ে নেবে
পৃথিবী ভাসিয়ে।)

জ্যোতিপ্রসাদ যখন রোমান্টিক আদর্শের সঙ্গে মার্ক্সীয় চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তখন তিনি বিশ্বজনতার ভিত্তি থেকে বিশ্বশৃঙ্গের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর গতিপথ ছিল মাতৃভূমি থেকে বিশ্বসভার উদ্দেশে এক ক্রমগতির যাত্রা। অন্যদিকে ধীরেন দত্ত শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবর্গের প্রতিনিধির মধ্যে বিপ্লবী চিন্তাচেতনা উদ্দীপিত করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। জ্যোতিপ্রসাদের দৃষ্টিতে শিল্পী ছিলেন 'জনতার শিল্পী', কিন্তু তিনি বিশ্বশিল্পীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ধীরেন দত্তের 'কাঠমিস্ত্রী' শ্রমজীবী অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্বারা নির্ণীত। তিনি যখন নিজের জন্য কাঠে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন তখন তিনি শিল্পী, কিন্তু অন্যের জন্য শ্রম করতে গিয়ে তিনি হয়ে পড়েন অনিবার্যভাবে শ্রমের উপাদান। তিনি শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'শ্রমিক'-এ পরিণত হন।

এই ধারার অন্য এক প্রতিভাধর কবি ছিলেন অমূল্য বরুয়া। কলেজে পড়ার সময় কলকাতায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে তাঁর করুণ মৃত্যু ঘটে। কবি হিসাবে তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ হয়নি। তিনি কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ দুআরা, গণেশ গগৈ, রত্নকান্ত বরকাকতি ও দেবকান্ত বরুয়ার অনুকরণে। কিন্তু মার্ক্সবাদী ভাবধারার প্রভাবে এবং বিশেষ করে 'জয়ন্তী'তে প্রগতিবাদী কবিতার আন্দোলন চলাকালীন তিনি সৌন্দর্যসন্ধানী আদর্শবাদী ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে শ্রেণিচেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে এক মার্ক্সবাদী বিপ্লবী কবিতে পরিণত হন। 'জয়ন্তী'তে প্রকাশিত তাঁর 'বিপ্লবী' শিরোনামে একটি কবিতা লক্ষণীয় —

"... আমি
উর্বরা মাটির কর্মনিষ্ঠ পূজারী
যুগ পরিস্থিতির প্রতীক
বস্তু আরু আদর্শর
দ্বন্দ্বাত্মক গতি
সংগ্রামলিপ্ত বিপ্লবী।'

(... আমরা

উর্বর জমির কর্মনিষ্ঠ পূজারি
যুগ-পরিস্থিতির প্রতীক
বস্তু ও আদর্শের
দ্বন্দ্বাত্মক গতি
সংগ্রামে লিপ্ত বিপ্লবী।)

'বিপ্লবী' এখানে এক ব্যক্তিমনের প্রতীক নয়। এটি এক সংগ্রামী মুক্তিকামী জনতার প্রতীক। শ্রেণিসংঘাত ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদের উল্লেখ এখানে প্রত্যক্ষ। উল্লিখিত কবিতাংশে তারই স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতার ভাষায় শ্লেষাত্মক পরিহাসও ফুটে উঠেছে —

"এই ভঙ্গু, পঙ্গু নরকমিশ্রিত দেহর দুর্ভোগ
আমি
গতিশীল শক্তির
পরম তৃপ্তিত
দিনে দিনে গঙ্গাস্নান করি
লভিছো মুক্তি।'
(এই ভগ্ন, পঙ্গু নরকমিশ্রিত দেহের দুর্ভোগ
আমরা
গতিশীল শক্তির
পরম তৃপ্তিতে
দিনে দিনে গঙ্গাস্নান করে
পেয়েছি মুক্তি।)

অমূল্য বরুয়ার কবিতা সম্পর্কে ভবানন্দ দত্তের বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। "অমূল্য বরুয়ার কবিতা ছিল সেই সময়ের অভিজ্ঞতার প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্রণ। তাঁর 'বেশ্যা' কবিতায় মহাসমরের আঘাতে বিলাসী শ্রেণির নৈতিক অধঃপতিত জীবনের কদর্য রূপ ফুটে উঠেছিল।"

'জয়ন্তী'-র পাতায় ঘন ঘন যাঁর কবিতা প্রকাশ পেত তিনি হলেন হেম বরুয়া। তিনি রোমান্টিক কবিতার ভাববিলাস পরিহার করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তবে তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি বলে মনে হয়। হেম বরুয়ার কবিতায় 'তীব্র শ্রেণিবিদ্বেষ' প্রকাশের কথা স্বীকার করেও ভবানন্দ দত্ত এই মন্তব্য করেছিলেন যে "সেখানে ছোটলোকের ব্যক্তিগতভাবে ধনী হওয়ার কামনা বা ধনী না-হতে পারার আক্রোশ আছে, কিন্তু ছোটলোকের জীবনের গভীর মূল্যবোধের পরিচয় নেই।" সে-কারণেই হেম বরুয়াকে তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক রোমান্টিক বলে মন্তব্য করেছিলেন। আমাদেরও মনে হয় হেম বরুয়া সমাজ-বাস্তবতাকে শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। কিন্তু কবিতার আঙ্গিকে হেম বরুয়া বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং রোমান্টিক ভাবধারার কবিদের ব্যবহৃত শব্দসম্ভার সযত্নে পরিহার করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি পরবর্তী পর্যায়ের আধুনিকতাবাদী কবিদের খুব কাছের মানুষ ছিলেন।

পঞ্চাশের দশকে 'রামধেনু' সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়ার পরে আমরা অন্য একটি বিবর্তন লক্ষ করি। 'জয়ন্তী'-র কবিদের বিষয়চেতনা থেকে নতুন কবিদের কাব্যচর্চার প্রক্রিয়ায় বিষয়-সচেতনতা প্রাধান্য পেল। তাঁদের জন্য আধুনিক জীবনের স্বরূপ কেবল বহির্বাস্তবে দৃষ্টি ফেলেছিল বলে মেনে নেওয়া যায় না। বহির্বাস্তবের প্রতিক্রিয়া যেহেতু ব্যক্তিমনে হয় সেহেতু সেখানে ব্যক্তিমনের সাড়া বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক ভূমিকা আছে। সংশ্লিষ্ট কবিরা অবশ্য রোমান্টিকদের সৌন্দর্যসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি পুনরায় মোহাবিষ্ট হয়ে ফিরে যাননি। এঁদের কবিতায় ফুটে উঠল অধিকতর আত্মসচেতনতা, যেখানে আবেগ-অনুভূতি বৌদ্ধিক রসায়ন-প্রক্রিয়ায় নিমজ্জিত হল। আধুনিকতা ও আধুনিক জীব সম্পর্কে এঁদের সংবেদনশীল মনে নানা প্রশ্নের উদয় হল। আধুনিকতার বিশৃঙ্খলার আড়ালে শৃঙ্খলার সন্ধান চলল। আর সে-কারণেই হয়তো শ্রেণিসংগ্রামের বিষয়টি এ-জাতীয় কবিতার বিষয় থেকে দূরে রয়ে গেল। তখন থেকে বামপন্থী কবিতার ধারা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে।

অসমিয়া সাহিত্যে ধারাবাহিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। 'জয়ন্তী' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে প্রগতিবাদী কবিতার ধারা কিন্তু একেবারে শুকিয়ে যায়নি। পরবর্তী সময়ের কয়েকজন কবি বামপন্থী ও আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তাঁদের মধ্যে কেশব মহন্ত ও নলিনীধর ভট্টাচার্য অন্যতম। তবে কেশব মহন্তের কবিতার প্রাণস্পন্দনে শ্রেণিচেতনার চেয়ে লোকজীবনের স্পন্দিত ছন্দই বেশি অনুভূত হয়। তাঁর 'সোনজিরা মাহী' কবিতায় লুমুম্বার মৃত শিশুটির সংবাদ পেয়ে সোনজিরা মাসি প্রশ্ন করে, "কোন্ এই মরা কেচুয়াটি/কোন্ তার মাক?/তার পিতাকেই বা কোন্?/জানোবা সিহঁতো কোনোবা মোরেই আপোন।" (কে এই মৃত শিশুটি/তার মা কে/তার পিতাই বা কে/হয়তো তারাও কেউ আমারই আপন।) এখানে শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে মানবতাবোধের সুরই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

॥ তিন ॥

অসমিয়া কবিতায় আধুনিকতাবাদ

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে অসমিয়া কবিতায় দেখা গেল নতুন এক ধারা। পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবে ঐশী ভাবনা থেকে মানব-কেন্দ্রিক চিন্তায় শিক্ষাদীক্ষা লাভকারী অসমিয়া সম্প্রদায়ের জনগণের চেতনা ফেরাতে নতুন কবিতার সৃষ্টি হয় এবং সেখানে রোমান্টিক ভাবধারা ও কাব্যরীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। চল্লিশের দশকে যে-বিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল তাতে 'জয়ন্তী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে-সব কবির আবির্ভাব ঘটে তাঁরা ছিলেন মার্ক্সবাদের দ্বারা প্রভাবিত। জয়ন্তী পত্রিকা ওই কবিদের প্রগতিবাদী আখ্যা দিয়েছিল বলে ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এটাও সত্যি যে 'জয়ন্তী'-র প্রভাব ততটা ব্যাপক হয়নি। ১৯৫০ সালে 'রামধেনু' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই নতুন কাগজ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষকতায় এক শ্রেণির নতুন কবিরও আবির্ভাব হল। পত্রিকাটি জন্মলগ্ন থেকে (১৯৫০) টানা ১৭ বছর অর্থাৎ ১৯৬৭ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় এবং তারপর বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় ১৯৭১ সালে নতুন পর্যায়ে প্রকাশের কাজ শুরু হয়। কিন্তু দু-বছর পর ১৯৭৩ সালে 'রামধেনু' সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

গত শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অসমিয়া আধুনিক কবিতার উপর যে-প্রভাব পড়েছিল তা উক্ত পত্রিকার মৃত্যুর পরও নিঃশেষ হয়নি। এই সময়ে অসমিয়া কবিতার যে-ধাঁচ গড়ে ওঠে তার বিশেষ পরিবর্তন এখনও চোখে পড়ে না। সে-কারণেই আধুনিক অসমিয়া কবিতার তিনটি বিবর্তনের এই পর্বটিকে সর্বশেষ বলে আখ্যায়িত করা যায়। অবশ্য ধাঁচ বা গঠন-প্রক্রিয়ার পরিবর্তন না-করেও বিভিন্ন কবি তাঁদের নিজস্ব মেজাজ অনুযায়ী কবিতার প্রকাশভঙ্গিতে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। 'রামধেনু'-র চর্চার মাধ্যমে প্রকাশিত এইসব নতুন কবিতাকে আধুনিকতাবাদী কবিতা হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

প্রগতিবাদী কবিদের চিন্তার সূচনায় ছিল শ্রেণিচেতনা। কিন্তু আধুনিকতাবাদীদের মনমেজাজ ব্যক্তিচেতনার দিকে ফিরে আসে। অবশ্য রোমান্টিকদের সৌন্দর্যসন্ধানী দৃষ্টি এবং জগতের প্রতি প্রসারিত মনের আবেগিক প্রকাশের পরিবর্তে তাঁদের কবিতায় বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হল আত্মসচেতনতা— যেখানে আবেগ-অনুভূতি বৌদ্ধিক রসায়নের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করল। ভারত-মার্কিন আধুনিকতাবাদী কবি টি. এস. এলিয়ট এবং এজরা পাউন্ডের দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চার দ্বারা তাঁদের কাব্যানুশীলন বিশেষভাবে প্রভাবিত হতে শুরু করে। শব্দসন্ধানের ক্ষেত্রে এঁরা প্রতীকবাদী, চিত্রকল্পবাদী ও মেটাফিজিক্যাল কবিতার পরীক্ষা তথা প্রয়োগের প্রতি অদ্ভুতভাবে আকৃষ্ট হলেন।

হেম বরুয়া তাঁর 'আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, "আধুনিক সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গিতে আধুনিক যুগের ব্যক্তিগত প্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে আছে।... কবিতার বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গিতে পাউন্ড, এলিয়ট, সিটোয়েল প্রমুখ স্বতন্ত্র ধরনের পৃথক স্বাক্ষর রেখেছেন।" এই প্রবন্ধেই তিনি উল্লেখ করেছেন যে আধুনিক সাহিত্যিকরা নতুন যে-জগৎটির সন্ধান করে থাকেন সেই পৃথিবী 'কল্পনার নয়, বাস্তবের'। আধুনিকতাবাদী কবির এই বাস্তবক্ষেত্রটি কিন্তু প্রগতিবাদী কবির দৃষ্টি থেকে শ্রেণিদ্বন্দ্বের সমাজবাস্তবতা নয়। বরং কবির ব্যক্তিমনের তীব্র ভাবানুভূতির মধ্য দিয়ে অনুভূত আধুনিক জীবনের বাস্তবতা। প্রগতিবাদী কবিতার অন্যতম প্রধান দিগ্‌দর্শক ভবানন্দ দত্ত এই নতুন কবিদের 'শব্দর মেরপাক' (শব্দের কারুকাজ), 'বাগাড়ম্বর' (বক্তব্যপ্রধান) ও 'বিচ্ছিন্ন কল্পনার কারসাজি' নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও দেখা গেল যে 'রামধেনু'-র পৃষ্ঠপোষকতায় এই আধুনিকতাবাদী কবিতার চিন্তাচর্চাই তখনকার তরুণ কবিকুলের মধ্যে প্রোথিত হয়ে আছে। বাংলা ভাষায় বিশের দশক থেকেই কবিতার রীতি ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যে-ধরনের পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে এবং রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা এক নিজস্বতার আকার নিতে আরম্ভ করে তার প্রভাবও আধুনিক অসমিয়া কবিতার উপর পড়ে। বিশেষত এই সময়ে আধুনিক কবিতার উপর দীপ্তি ত্রিপাঠীর গবেষণামূলক গ্রন্থটি প্রকাশ পাওয়ায় তাঁর বিশ্লেষণও তরুণ অসমিয়া কবিকুলকে নিশ্চিতভাবে টেনেছিল। যা হোক, এই তৃতীয় পর্বের বিবর্তনে আধুনিকতার প্রতি ব্যক্তিমনের ভাবাদর্শ রোমান্টিক ও প্রগতিবাদী কবিতার চেয়ে ভিন্ন চেহারা পায়। কাব্যরীতির ক্ষেত্রে এইসব কবি সচেতনভাবে উপলব্ধিকে নৈর্ব্যক্তিক হিসাবে প্রকাশের এক পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। এঁরা আধুনিকতার (modernity) প্রতি যে-আগ্রহ বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন সেখানে রোমান্টিকদের মতোই কবিমনের ব্যক্তিগত সাড়া থাকলেও তা কেবল রোমান্টিক ধাঁচের আবেগেই পর্যবসিত হয়নি। আগেই বলা হয়েছে যে এই

আগ্রহ বা সাড়া বৌদ্ধিক চিন্তার রসায়ন স্পর্শ করেই আসতে শুরু করে।

প্রগতিবাদী কবিরা মার্ক্সীয় দর্শনের আধারে বাস্তব জীবনকে নিরীক্ষণ করে তার অর্থনৈতিক ভিত-এ মধ্যবিত্তের প্রবল অবস্থানের হদিশ পান এবং শ্রেণিবিভক্ত সমাজে তাঁদের নান্দনিক ভূমিকাটিকে সর্বহারার সহযোগী করে তোলেন। অন্যদিকে আধুনিক জীবনের দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে সেই সময়ের কবিকুল জীবন-জগতে আধুনিকতার সঙ্গে আগত জটিল পরিবর্তনের প্রতিও নজর দিয়েছিলেন এবং এই জটিলতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সংবেদনশীলতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কাব্যিক ত্রুটির সন্ধান করেন। আধুনিক জীবনের জটিলতা যে অনিশ্চয়তা, শঙ্কা ও বিশৃঙ্খলার আপাতদৃষ্ট স্তরের জন্ম দিয়ে থাকে তার ভিতরে কী শৃঙ্খলা আছে তারও অনুসন্ধানে রত হন ওই কবিকুল। এই কবিরা প্রতীকবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁদের কবিতায় প্রতীক ব্যবহার রোমান্টিক কবিতার প্রতীক ব্যবহারের চেয়ে ভিন্ন হয়। রোমান্টিক কবিতার প্রতীক এসেছিল রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধানে, সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধিতে। আধুনিকতাবাদীর কবিতায় প্রতীক এসেছে অভিধার মধ্য দিয়ে অপ্রকাশ্য উপলব্ধিকে মূর্ত করার প্রয়োজনে আর সেটা এল ভাষার ধ্বনিগত ব্যঞ্জনার ওপারের অন্য এক প্রতীকী স্তরের সন্ধানে। এর জন্য প্রকাশভঙ্গি হল তির্যক। চিত্রের নির্মাণ শুরু হল বৌদ্ধিকভাবে এবং তার অবলম্বন হল উৎপ্রেক্ষাধর্মী অর্থালংকার। রোমান্টিক কবিতায় ব্যবহৃত বিশ্লেষণধর্মী শব্দালংকার পরিহারের চেষ্টা করা হল। রোমান্টিক শব্দচয়ন থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াসের ফলে সার্থক কবিদের প্রকাশভঙ্গিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে লাগল। আবেগকে সংহত করার প্রচেষ্টার ফলে ভাষায় চলে এল 'আয়রনি'-র ব্যবহার, উক্তিতে এল বিরোধাভাস— আর তা এল কাব্যপঙ্‌ক্তির অর্থের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে মানসিক অনিশ্চয়তা প্রকাশের তাগিদে। জীবনের আপাত ভগ্ন রূপ— এলিয়ট যাকে বলেছেন 'a hope of broken image'— তার অসংলগ্নতাকে সংলগ্ন করার জন্য আপাত-সম্পর্কহীন ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকল্পকে যুগপৎ উপস্থাপন করার এক রীতি প্রয়োগ শুরু হল। এই চিত্রকল্পগুলিকে অভিধার স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে দেখার ফলে সাধারণ পাঠক তা 'দুর্বোধ্য' মনে করতে থাকে। তবে বুদ্ধিদীপ্ত পাঠকগণ সেখানে একটি তাৎপর্যের ঐক্যসূত্র খুঁজে পেলেন।

আধুনিকতাবাদী কবিতায় কবিতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল আর তার ফলে ফর্ম নিয়ে বেশ নাড়াচাড়া শুরু হল। এইসব কবিতায় এলিয়টের নৈর্ব্যক্তিকতার ধারণার প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে। এলিয়ট বলেছেন "Poetry is not turning loose of emotion, but an escape from emotion." তাঁর মতে কবিতায় প্রকাশের জন্য কবির কোনো 'ব্যক্তিত্ব' থাকে না। কবিতা হল কবির জন্য একটা মাধ্যম মাত্র এবং কবির (তিনি আর্টিস্ট বলে আখ্যা দিয়েছিলেন) বিকাশে ঘটে ক্রমাগত আত্মত্যাগ ও ব্যক্তিত্বের ক্রম-নির্বাপণে (a continual extinction of personality)। তিনি ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের 'spontaneous overflow of powerful feeling' কথাটি ব্যাখ্যা করে সেটিকে এক 'dumping ground of emotion' বলে মন্তব্য করেছেন। এলিয়টের এমনতরো ধারণা অসমিয়া আধুনিকতাবাদী কবিদের আকৃষ্ট করতে শুরু করল এবং তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও অনুরূপ ধারণার প্রভাব পড়ল। তাঁরা নৈর্ব্যক্তিকতার প্রয়োজনে কবিতায় প্রথম পুরুষের উক্তিকারক 'মই' অর্থাৎ আমি)-এর কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। কবিতার 'মই' হল এক person, এক নির্মিত সত্তা, যার মধ্য দিয়ে আবেগ ও ধারণার একটি মিশ্রিত চিত্রকল্প এবং বাগ্‌ভঙ্গির ভিতর দিয়ে ব্যক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া কাব্যকৌশলে স্থান করে নিল। এই আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে রোমান্টিক কবিতার উক্তিকারকও একজন persona মাত্র, কাব্যোক্তির জন্য নির্মিত এক ভাষিক কৌশল। কিন্তু রোমান্টিক কবিরা তাঁদের কবিতার বুনিয়াদ বা কাব্য-প্রক্রিয়ার প্রতি তেমন সচেতন ছিলেন না। তাঁদের কবিতার উক্তিকারক ('মই') তাঁদের নিজের থেকে পৃথক হোক তা চাননি। এই সত্তা তাঁদের জন্য ছিল কবিহৃদয় থেকে উচ্চারিত তীব্র আবেগ-অনুভূতির প্রকাশক। অন্যদিকে আধুনিকতাবাদীরা আত্মসচেতনভাবে কাব্যসৃষ্টির প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়ে কবি ও কাব্যিক সত্তার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টিতে প্রয়াসী হন। অর্থাৎ কবিতায় 'মই' (আমি) এক বিভক্ত আমি। এটা একদিকে কাব্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের একটি কৌশল, আবার অন্যদিকে এটি এমন এক কবিসত্তা যা ভাব-অনুভূতি বহন করে কবির বৌদ্ধিক-আবেগিক উপলব্ধিকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রক্ষেপের জন্য। এই 'মই' (আমি) একটি নির্মিত আমি, যাকে আধুনিকতাপন্থী কবিরা নিজেদের সঙ্গে একাকার করতে চাননি। রোমান্টিকতাবাদীদের মতে কাব্যিক উচ্চারণের স্রষ্টা কবি স্বয়ং। আধুনিকতাবাদীদের মতে কবিতা আদৌ সৃষ্টি

বা নির্মাণ কি না সে-বিষয়ে দ্বিধা রয়েছে। একে এক কাব্যিক নির্মাণ হিসাবে গ্রহণ করলেও কবি কিন্তু এটিকে তাঁর দ্বারা 'ভাষার ব্যবহার' বলে মনে করেন। ভাষার স্বতন্ত্র নির্মাণ (যেখানে কবি কেবল একটি মাধ্যম মাত্র)— এমনতরো কথা অবশ্য আধুনিকতাবাদী কবিরা বলেননি। সংশ্লিষ্ট কবিদের ধারণা এমন— আবেগের আবির্ভাবে কবির মনে যে-সংবেদনের সৃষ্টি হয় সেটিকে বৌদ্ধিক স্তরে উন্নীত করা প্রয়োজন, কারণ তার ফলে কবিসত্তায় এক বোধের সৃষ্টি হয়। এই বোধকে প্রকাশ করতে যথেষ্ট শব্দের প্রয়োজন, যা সরাসরি মেলে না। এবং সে-কারণেই চিত্রকল্প ও প্রতীকের মধ্যে উপযুক্ত প্রতিরূপ সৃষ্টি করা হয়। কবিসত্তায় সৃষ্টিশীল কল্পনা যে-বোধের জন্ম দেয় সেই বোধ নির্মিত হয় ভাষায়। সৃষ্টিকারী মন এবং তাকে নির্মিত রূপ দানকারী কবি যেন বিভাজিত হয়েও এক— এমন একটা দ্বিধা আধুনিক কবিতার নির্মাণ-প্রক্রিয়ায় লক্ষ করা যায়। নবকান্ত বরুয়ার 'রত্নাকর' এক রূপান্তরের কবিতা। একটি স্তরে কাব্যিক প্রক্রিয়ায় বৌদ্ধিক-আবেগিক সংবেদনাকে যেন বিশেষভাবে করা এক রূপান্তর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া 'সৃষ্টি না কি নির্মাণ'— এ-কথাটি কবি দ্বিধাবিভক্ত করে রেখেছেন, যেন আধুনিকতাবাদী সংবেদনারই এক রূপক এই কবিতা। আধুনিকতাবাদী কবি কল্পনার সৃষ্টিশীল শক্তিকে অস্বীকার না-করলেও রোমান্টিক কবিদের মতো তার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবেগকে বৌদ্ধিক চিন্তার ছাঁকনির মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। ফলে ধ্বনিস্পন্দনে আবেগকে আলোড়িত করার চেয়ে চিত্রকল্পের মধ্যে তা সংহত করার চেষ্টা করে থাকেন।

আধুনিকতাবাদী কবিতায় পাঠককে কবিতার নির্মাণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হতে হয়, কারণ কবিতার বক্তব্য থেকে প্রক্রিয়াকে পৃথক করে দেখলে তার তাৎপর্য সেভাবে ধরা পড়ে না। অজিৎ বরুয়ার 'মন-কুঁঅলী সময়' (মন-কুয়াশার সময়) কবিতাটিকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কবিতাটি ব্যক্তিমনে এক বিশেষ মুহূর্তের উপলব্ধির অভিজ্ঞান। 'এক পলকর দলং' (এক পলকের সেতু)-এ সংযোজিত হয়েছে দুটি পৃথক সময়ের মানসিক অভিজ্ঞতার স্মৃতি। এই সংযোজন ওঅর্ডস্ওঅর্থের একই স্থানের এক অভিজ্ঞতার উপর অন্য একটি সময়ের অভিজ্ঞতার সমারোপণ (superimposition) নয়। কবিতাটির মধ্য দিয়ে অজিৎ বরুয়া তাঁর এই উপলব্ধির স্বরূপ বর্ণনা করার চেষ্টা করেননি। বরং 'এক-পলকের-সেতু'-তে সময় থমকে যাওয়ার উপলব্ধির শেষে একটি সজ্ঞান প্রশ্নবোধক চিহ্নই বিরাজমান— আর এই চিহ্নটি কেবল এক যতিচিহ্নই নয়, বন্ধনীর মধ্যে এটিকে বিশেষ ব্যঞ্জনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যদি কোনো পাঠক কবিতাটিতে বক্তব্যের সন্ধান করে তাহলে সেই বক্তব্য এই প্রশ্নবোধক চিহ্নের ভিতরেই খুঁজতে হবে। প্রশ্নবোধক চিহ্নটি দুটি অভিজ্ঞতার সংযোগস্থলে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বক্তব্য খুঁজতে গিয়ে পাঠকরা লক্ষ করবেন যে সজ্ঞান প্রশ্নবোধক চিহ্নটি একটি বন্ধনীর মধ্যেই রাখা হয়েছে এবং তার পরে কয়েকটি বিন্দুচিহ্ন, অর্থাৎ এই প্রশ্নেই এর শেষ নয়, তার পরেও যেন আরও কিছু আছে। প্রশ্নটি কবিতার বিষয়ীর (persona) নিজের প্রতি জিজ্ঞাস্য যেন কোনো শব্দের মধ্য দিয়ে নয়, ভ্রূকুটির মাধ্যমেই উপস্থাপন করা হয়েছে। বিন্দুগুলোর জন্য এই প্রশ্নে এক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। সময় স্থির হয়ে যাওয়া 'এক পলকের সেতু'-র (যা এক মানসিক অবস্থার রূপক) 'থাকা না-থাকা'-য় অনিশ্চয়তা থাকে কেমন করে?

এখানে এক বৌদ্ধিক-আবেগিক গ্রন্থির তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা চিত্রকল্পে স্তব্ধ হয়ে তাৎক্ষণিকতার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। কবিতাটিতে 'মন-কুঁঅলী' (মন-কুয়াশা), 'ধোঁয়া-রাতিপুআ' (ধোঁয়া-সকাল), 'কুঁঅলী-গলি' (কুয়াশা-গলি) ইত্যাদি জোড় শব্দ রয়েছে এবং এই দুটিকে পৃথক করলে তার তাৎপর্য ব্যাহত হয়। তবে একটি শব্দ অপরটির বিশেষণের দায়িত্ব পালন করেছে বলেও ধরে নেওয়া যায় না। ইংরেজ কবি জেরাল্ড ম্যানলি হপকিন্সের কবিতায় ব্যবহৃত জোড়-শব্দগুলির মতো এখানেও এ-রকম ব্যবহার লক্ষণীয়। কবিতাটির শেষে একটি বাক্য রয়েছে— 'গুনগুন করে ধোঁয়া উঠেছিল'। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতির এমন মিশ্রণ ঘটেছে যে-ধরনের মিশ্রণ ফরাসি কবি বোদলেয়ারের কবিতায় প্রায়শ লক্ষ করা যায়। গুনগুন করে শব্দ শোনা যায় কানে, ধোঁয়া অস্পষ্টভাবে দেখা যায় চোখে। শ্রুতিতে ব্যবহৃত ক্রিয়া-বিশেষণকে দৃষ্টিতে ধৃত একটি ছবিতে স্থানান্তরিত করে ছবি ও ধ্বনির সংমিশ্রণ করা হয়েছে। এই বাক্যের শেষের শব্দ 'উঠিছিল' (উঠেছিল)-এর প্রতিটি অক্ষর একটা থেকে অন্যটাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। লিখিত স্থানে সৃষ্ট এই দূরত্ব কালের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করেছে। বর্তমান অভিজ্ঞতার একটি ছবি (অতীতের সঙ্গে) সংযোজিত হয়ে সেই পলকটিতে দীর্ঘ অনুরণনের সৃষ্টি করেছে। কবিতাটিতে সময়ের এই ব্যবহার সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক,

ঘড়ির কাঁটার নির্দিষ্ট গতির সময় প্রবাহ নয়। কবিতাটিতে 'নীরব গধূলি পথারর মাজত অকলে থিয় হোআ' (নীরব গোধূলির মাঠের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকা) বাক্যটি অসমাপিকা ক্রিয়ায় অসমাপ্ত হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ বিষয়ীর উপলব্ধি শেষতম উপলব্ধি নয়।

নিবিড় জটিল বোধের উন্মোচনে আধুনিকতাবাদী কবি বাগ্‌বিস্তারের বিরোধিতা করেন, প্রতিটি শব্দের দ্যোতনাময় ধর্মকে উপলব্ধির বাহক হিসাবে গণ্য করেন এবং তার অনুশীলন করেন জটিল বোধের কারণেই। তেমন একটি প্রক্রিয়াই অজিৎ বরুয়ার উল্লিখিত কবিতায় ফুটে উঠেছে। এলিয়ট, হপকিন্স ও ফরাসি কবি লাফর্গ-এর প্রভাব কবি অজিৎ বরুয়া আত্মস্থ করেছেন এভাবেই।

ধ্বনির লয় থেকে সরে এসে গদ্যছন্দের দিকে ঘেঁষার জন্য অসমিয়া আধুনিকতাবাদী কবিতা বেশি চিত্রকল্পপ্রধান হয়ে পড়েছে। এ-ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন চিত্রকল্পবাদের প্রভাব অসমিয়া কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু হীরেন ভট্টাচার্যের চর্চা ও ধারণা এর ব্যতিক্রম। তাঁর কবিতায় ধ্বনিস্পন্দনের বেশি প্রাধান্য দেখা যায় এবং তাঁর কবিতার ছবি melopoea বা ধ্বনির লয়-লাস্য গতিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস পায় না। তিনি ছন্দসজ্জার ব্যবহার না-করে অনুপ্রাসের কৌশলকে হাতিয়ার করেন। এ-ক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— "কবিতার শব্দ কেবল শব্দই নয়, তা ধ্বনিও, কবিকণ্ঠের শব্দ যখন প্রতিধ্বনি হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসে তা যেন সেই পুরনো অবয়বেই। শব্দের এই বেড়ে আসাই হল কবির নির্মাণ... শব্দের শিল্প কবিতার মুদ্রিত অক্ষরেই আবদ্ধ নয়। এটি যে কণ্ঠেরও শিল্প।" অন্যদিকে অজিৎ বরুয়া তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'কিছুমান পদ্য আরু গান' (কয়েকটি পদ্য ও গান)-এর ভণিতায় বলেছেন, "শব্দের ব্যবহারই সব।... ভাষা? লেখার পরম মুহূর্তে সে হবে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর কথা বলার ভাষা। কিন্তু সমস্ত শব্দের সেখানে যথাযথ স্থান থাকবে, সুরও হবে কথোপকথনের। সাধারণ কথার ভেতরেই একটা অসাধারণত্ব ফুটে-ওঠা ভাষা। অসাধারণত্ব আসবে লেখকের লজ্জিত তড়িৎস্পর্শে।" এই দুজনের উক্তিতে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু দুটি উক্তির মধ্য দিয়ে এটা উপলব্ধি করা যায় যে আধুনিকতাবাদী কবিরা অত্যন্ত ভাষা-সচেতন হয়ে পড়েছিলেন। আর তার প্রভাবও ওই কবিদের কবিতার আঙ্গিকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, আধুনিকতাবাদী কবিতার ক্ষেত্র নির্মাণে 'রামধেনু' এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ১৯৫৪-৫৫ সালে সপ্তম বছরের সম্পাদকীয় নিবন্ধে আধুনিক কবিতার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং সেই সময়ের প্রগতিবাদী ও আধুনিকতাবাদী দুটি ধারার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে লিখেছিলেন— "একদিকে একাংশ কবি ব্যক্তির নিঃসঙ্গ দিকটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে অন্যরা চেষ্টা করছেন সামাজিক রূপান্তরের।" উভয়বিধ কবিতার নতুনত্ব ও দুর্বলতার প্রতিও লক্ষ্য ছিল তাঁর এবং সে-দিকটি তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "একান্ত নিজের ভাষা, যুগোপযোগী চিত্রকল্প, নতুন খণ্ডবাক্য ও আকর্ষণীয় প্রকাশভঙ্গির সৃষ্টি কাব্যরীতিতে একটি যুগান্তর এনেছে। কাব্য-উপেক্ষিত বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে কবিরা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কাব্যে স্থান দিয়েছেন, কিছু কিছু কবিতার দ্বারা সামাজিক অন্যায়, অসাম্য ও শোষণ দূরীভূত করার মানসে মানুষের মনে সক্রিয় অনুভূতি জাগাবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা।"

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের বক্তব্য অনুযায়ী অসমিয়া আধুনিকতাবাদী কবিতায় 'ব্যক্তির নিঃসঙ্গ জীবন'-এর অভিব্যক্তি প্রকাশ পেলেও মহানগরীয় জীবনের নিঃসঙ্গতার ছবি সেখানে খুব বেশি পরিলক্ষিত হয় না। পঞ্চাশের দশকে গুয়াহাটি শহর শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠার ফলে অসমিয়া তরুণসমাজ অধ্যয়নের জন্য এখানে ভিড় করতে থাকেন এবং কটন কলেজ তাঁদের চিন্তাচর্চার প্রাণকেন্দ্র হয়ে পড়ে। ইংরেজি ও বাংলা আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের যে-সংস্পর্শ ঘটে তাতে তাঁদের কবিতায় এক আকৃতির হদিশ মেলে। কিন্তু গুয়াহাটি শহরে তখনও মহানগরীয় জীবনের দ্রুততা, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি প্রকট হয়ে পড়েনি। পড়াশোনার জন্য আগত তরুণদের গ্রামজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং সম্পূর্ণ নাগরিক জীবনের মনোভাব তাঁদের মানসিক চিন্তাচর্চায় ব্যাপ্তি লাভ করেনি। কিন্তু নগরকেন্দ্রিক আধুনিকতার প্রতি ব্যক্তিমনের সচেতন সাড়া নবকান্ত বরুয়ার একাংশ কবিতায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর এই বোধের কেন্দ্রে ছিল কলকাতা (অসমিয়াতে তখন 'কলিকতা' বলা হত)। নবকান্তের 'হে অরণ্য, হে মহানগর'-এ অরণ্য মহানগরের উৎপ্রেক্ষায় পর্যবসিত। তার অভিব্যক্তিও মেলে 'কাজিরঙা, ডবকার অরণ্য অপস্মার', 'সরীসৃপ ক্রূর মৃত্যু', 'সর্পিল জীবন' প্রভৃতি উল্লেখের মধ্যে। এমন বর্ণনার

পাশাপাশি উচ্চারিত হয়েছে আধুনিক নগর-জীবনের তিনজন যুবতী 'হেনা', 'মধুমালা' ও 'অলকানন্দা'-র কথা। কবি তাদের চেহারার বর্ণনায়ও রোমান্টিক আবেগে ফুটিয়ে তোলেননি তাদের 'রঙা নীলা শেঁতা মুখ' (লাল নীল সাদা মুখ)। এখানে বর্ণনা অনিশ্চিত। প্রকৃতপক্ষে তাদের মুখের আদল কী ধরনের তা স্পষ্ট নয়। অরণ্যকে মহানগরের উৎপ্রেক্ষার ধারণা নবকান্ত বরুয়ার নিজের নয়। এটা 'কংক্রিটের জঙ্গল' কথারই যেন প্রতিধ্বনি। কিন্তু কবিতাটিতে এই কংক্রিট জঙ্গলের স্বরূপ যেভাবে মূর্ত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে নগরজীবনের বিরোধাভাস ফুটে উঠেছে। কণ্ঠরোধকারী ট্রাফিকের সঙ্গ হয়ে উঠেছে অরণ্যে রক্তচক্ষুর শ্বাপদ (বাঘ ইত্যাদি)। সেখানে 'ভয় ও অবিশ্বাসের জটিল উৎকণ্ঠা' কবিতাটির চিত্রকল্পে আধুনিক নগরজীবনের বিপরীতমুখী উৎকণ্ঠা ও আকর্ষণ, ভয় এবং আশ্বাস পরিহাসময় হয়ে ফুটে উঠেছে। কবিতার বিরোধাভাসে দেখা যায় নগরের ট্রাফিকে আছে স্পন্দনও। কলকাতা মহানগরের বাণিজ্য-কেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের আকর্ষণ-বিকর্ষণের পরস্পরবিরোধী অনুভূতি এই কবিতার জটিল চিত্রকল্পে পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে 'জীবন জীয়াই (বেঁচে) থাকে', কিন্তু সঙ্গে বেঁচে থাকে 'জীবিকার গলির সাঁথব' (জীবিকার গলির রহস্য)। শহরের জীবনের বিরোধাভাস নবকান্ত বরুয়ার কবিতায় যেমনটি ধরা পড়েছে ঠিক তেমনটি না-হলেও বীরেশ্বর বরুয়ার কিছু কবিতায় নগরজীবনের ক্লান্তি উপমার মধ্য দিয়ে চিত্রকল্পের রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর একটি কবিতায় দেখা যায় "কর্মক্লান্ত যন্ত্রর/এক সুরীয়া শব্দ আহি/ মোর বুকুত ঠেকা খাইছে/ যেন রাতির কোঅরি ফালি/নির্বাসিত হৈছে পরীয়া কুকুরর আর্তনাদ।" (কর্মক্লান্ত যন্ত্রের/এক মধুর শব্দ এসে/আমার বুকে দিয়েছে ধাক্কা/ যেন রাতের নীরবতা ভেঙে/নির্বাসিত হয়েছে পোষা কুকুরের আর্তনাদ।) নাগরিক জীবনের ক্লান্তি এসেছে এই জীবনের যান্ত্রিকতা থেকে।

একাংশ আধুনিক অসমিয়া কবির কবিতায় অতীতের দিকে ফিরে দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নবকান্ত বরুয়া, অজিৎ বরুয়া, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কেশব মহন্ত প্রমুখ কবিদের কবিতায় অতীত জীবনের প্রতি আগ্রহ বা অতীতের স্মৃতিচারণ আছে। কিন্তু এই অভিলাষকে আমরা নস্টালজিয়া বলে মেনে নিতে পারি না। বর্তমানের জটিল অনিশ্চয়তা নিঃসঙ্গতা কখনো ক্রূর এবং কখনো-বা রিক্ত জীবনের স্থিতিকে অতীতের সহজ জীবনের সঙ্গে তুলনা করার কিংবা তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান জীবনকে উপলব্ধি করার প্রয়াস এ-রকম কবিতায় দেখা যায়। অনেক সময়েই অতীত হয়ে ওঠে বর্তমানের মেটাফোর। একটা সময়কে অন্য একটা সময়ের এবং একটি অবস্থাকে আর-একটি অবস্থার মেটাফোর রূপে গ্রহণ করা যায় না বলে ভাবা অনুচিত। যেমন আজকের ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌মের লেখকদের একটা উদ্ভট বা কাল্পনিক ঘটনাকে কখনো বাস্তবায়ন করে বাস্তব অবস্থার মেটাফোর করতে দেখা যায়। ইতিপূর্বে উল্লেখিত 'মন-কুঁঅলী সময়' কবিতায়ও অতীত আছে, কিন্তু সেই অতীতের স্মৃতি নস্টালজিয়া হয়ে পড়েনি। অতীত স্মৃতি উদ্‌বেলিত হয়ে বর্তমানকে ম্লান করে দেয়নি।

আধুনিকতাবাদী পর্বের অন্যতম প্রধান কবি হলেন নীলমণি ফুকন। তাঁর কবিতার আধুনিকতায় নগর-চেতনা নেই। এক রোমান্টিক মেজাজের বিস্ময়বোধ তাঁর কবিতায় প্রায়ই দেখা যায়। অথচ তিনি আধুনিক। এলিয়টপন্থী আধুনিকতার ধারণায় রোমান্টিকতা-বিরোধ লক্ষ করা যায়। কিন্তু এলিয়টের নৈর্ব্যক্তিকতার ধারণার প্রভাব থাকলেও অসমিয়া কবিতায় প্রতীকবাদেরও প্রভাব পড়েছে এবং বহু ক্ষেত্রে প্রতীকবাদ রোমান্টিকতাবাদের এক সম্প্রসারিত রূপ। প্রতীকবাদে যেভাবে আপাতবাস্তবের আড়ালে এক আদর্শ জগতের হদিশ মেলে, তেমন হদিশ নীলমণি ফুকনের কবিতায়ও পরিলক্ষিত হয়। নিজের অন্তর্দৃষ্টির আলোয় বিশ্বের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে নীলমণি নতুন কলা-কৌশলের সন্ধান এবং নতুন করে ভাষার পরীক্ষার প্রয়োজন বোধ করেছেন। কাব্যিক সত্যের সন্ধানে তিনি প্রতিবাদীদের মতো হলেও কাব্যরীতির ক্ষেত্রে চিত্রকল্পবাদী কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন। চিত্রবাদীদের ক্ষেত্রে রজার ফাউলারের বক্তব্য অনুযায়ী "the poem projected by imagism is a laconic complex in which painting or sculpture seem as if it were just coming over into speech"— এই কথাগুলি নীলমণি ফুকনের কবিতার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। চিত্রকল্প ও ভাস্কর্যের সঙ্গে সংযোগের ফলে নীলমণির প্রতিভা খুব সহজেই চিত্রধর্মিতাকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। অর্থালংকার ব্যবহারে বাহুল্য বর্জন এবং বাক্‌সংযম তাঁর অনুশীলনের অঙ্গ হয়েছিল, আর এর মধ্য দিয়ে তাঁর ভাষা তীব্রভাবে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছিল। স্পেনের কবি লোরকার কাব্যচিন্তা এবং জাপানি হাইকু, সেইসঙ্গে তাং যুগের চিনা কবিতার বাক্‌সংযম ও তীব্র ইঙ্গিতময়তাও ফুকনের কবিসত্তাকে আলোড়িত করতে দেখা যায়। তাঁর লিরিকধর্মী একেকটি পূর্ণ কবিতা যেন একাধিক চিত্রকল্পের ইঙ্গিতময় সমষ্টি, যার মধ্যকার

শূন্যস্থান জুড়ে যেন একটি নীরব নাটক চলতে থাকে। 'ওলমি থকা গোলাপ জামুর লগ্ন' (ঝুলন্ত গোলাপজামের লগ্ন) কবিতায় এক প্রকাশাতীত উপলব্ধির অনির্বচনীয়তা আছে, যেখানে বিস্ময়বোধ ব্যাপ্ত। এই অমূর্ত উপলব্ধিকে মূর্ত করে তুলতে কবি অভিনব মেটাফোর-এর সাহায্য নিয়েছেন। কবির বিস্ময়-বিহ্বল উপলব্ধিতে এসেছে 'কাহানিও নিনাদিত হৈ নুঠা কিছুমান শব্দ' (কখনো ঝংকৃত না-হওয়া কিছু শব্দ)। শ্রবণে অপ্রবেশ্য সেই 'কিছুমান শব্দ'-এর রূপ দৃষ্টিগোচর করতে কবি নানা ধরনের প্রতিরূপ খুঁজেছেন 'গোলাপী জামু' (গোলাপজাম), 'সামুদ্রিক চরাই' (সামুদ্রিক পাখি), 'তপত লাভা' (তপ্ত লাভা), 'পাগলাদিয়া' (একটি খরস্রোতা নদীর নাম), 'বাঁহী' (বাঁশি) ইত্যাদির মধ্যে। এইসব প্রতিরূপের মাধ্যমে যে-চিত্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে তাতে এক ধরনের ধ্বংসজড়িত (ভয়ংকর) সৌন্দর্য ধরা পড়ে। মেটাফোরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত এইসব প্রতিরূপ যে ক্ষণস্থায়ী সেই উপলব্ধি এসেছে কবিতার শেষ পর্যায়ে— যখন কবি শব্দসমূহের প্রাচীন শীতলতাকে সম্বোধন করেছেন। এখানে নীলমণি ফুকন রোমান্টিক কবির সংশ্লেষী কল্পনা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সংশ্লেষী কল্পনা বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়কে সংলগ্ন করে। আধুনিকতাবাদী কবি ফুকনের জন্য 'কাহানিও নিনাদিত হৈ নুঠা কিছুমান শব্দ'-এর স্বরূপ জটিল। তিনি উৎপ্রেক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকাশের অতীত বিষয়টিকে প্রকাশের মধ্যবর্তী স্থানে আনার প্রয়াস করেছেন। উপলব্ধির বাইরের স্তরের আড়ালে কী সারমর্ম রয়েছে তার সন্ধান তিনি করেছেন এবং ইঙ্গিতময় চিত্রকল্পের মাধ্যমে তার ভিন্ন ভিন্ন ছবি সংলগ্ন করে সেই সারবত্তাকে উদ্ভাসিত করে তুলতে চেয়েছেন। এখানে কল্পনা বিষয় ও বিষয়ীকে সংলগ্ন করেনি। বিষয়ী বিহ্বল দৃষ্টিতে ভাষার জাদুগুণে উপলব্ধ বিষয়কে মূর্ত করতে চেয়েছে। অর্থালংকারের ক্রিয়াময় শক্তির উপর তিনি নির্ভর করেছেন। ভাষার এই ব্যবহারের দ্বারা ক্ষণিকের মধ্য দিয়ে চিরন্তনকে উপলব্ধি করার প্রয়াস নীলমণির কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর কবিতার আধুনিকতা এখানেই।

হরি বরকাকতি ও নির্মলপ্রভা বরদলৈ-এর দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিক উৎস থেকে এলেও তাঁদের প্রকাশভঙ্গিতে নতুনত্ব ফুটে উঠেছে। কবি নির্মলপ্রভার মনের প্রক্ষেপ সৌন্দর্য সন্ধানের মধ্য দিয়ে আধুনিক জীবনের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। ষাটের দশক থেকে তাঁর রোমান্টিক জীবন-বীক্ষণে জটিল আধুনিক জীবন সম্বন্ধে সচেতনতার প্রবেশ ঘটে। সেইসঙ্গে ভাষার ব্যবহারে এসেছিল অসাধারণ পরিমিতিবোধ এবং উৎপ্রেক্ষাধর্মী অর্থালংকারের তির্যক ব্যঞ্জনা। তিনি রোমান্টিক সৌন্দর্যসন্ধান কখনো পরিত্যাগ করেননি। কিন্তু এটাও সত্যি যে তার সঙ্গে জুড়ে ছিল এক বৌদ্ধিক ঔৎসুক্য। এই সংযোগের মনোরম ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছিল অসংখ্য কবিতা। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে বারোটি মাস নিয়ে রচিত কবির ঋতু-বিষয়ক কবিতার সমাহার। এই কবিতাগুলিতে ঋতু-পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতির বর্ণময় রূপ দ্যোতনাময় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তবে বৌদ্ধিকভাবে চিত্রকল্পের ব্যবহার প্রতিটি মাসের একেকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ বিশেষ ইঙ্গিতময়তায় ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে স্পর্শ করেছে। মনে হয়, এ যেন একটি সৌন্দর্যেরই ভিন্ন ভিন্ন বারোটি রূপ। জ্যৈষ্ঠ, পৌষ, চৈত্র ইত্যাদির উগ্রতার অন্তরালেও আবিষ্কৃত হয়েছে এক সমাহিত সৌন্দর্যময় রূপ। এই রূপান্তরে রোমান্টিক কল্পনার স্পর্শ লেগেছে। কিন্তু এর ভাষাপ্রয়োগ আধুনিক, চিত্রকল্পবাদের প্রভাবে ভাবচিত্রের সৃষ্টি।

লোকজীবনের স্পন্দন নির্মলপ্রভার কবিতায় অন্তঃসলিল হয়ে থাকে। এমন-কি জীবনের শেষদিকে কিছু কবিতায় দার্শনিক অনুসন্ধানেরও প্রকাশ লক্ষ করি আমরা। কয়েকটি কবিতায় সত্য সম্বন্ধে কবির নিজস্ব বোধ উপলব্ধ হয়। যে-বোধ ছিল কবির সামগ্রিক জীবনবোধের অঙ্গ।

হরি বরকাকতির কবিতার 'সোনপাহী' আগাপাশতলা অসমিয়া নাম। পাশাপাশি ভালোবাসার নারীর প্রতি নিভৃত সম্বোধনও। সোনপাহীর সঙ্গে কবিতার বিষয়ীর সম্বন্ধ চরিত্রগতভাবে রোমান্টিক প্রেমের। কিন্তু বিষয়ী প্রায়শ একজন আধুনিকতাবাদীর প্রতি সন্দেহপ্রবণ, সিনিকও (cynic)। তাঁর প্রেমের সম্বোধনকে আধুনিক জীবনের বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি ভারাক্রান্ত করে। কবিকে একইসঙ্গে তাই বলে নিরাশাবাদীও বলা যায় না। তাঁর রোমান্টিক দৃষ্টি আধুনিকতার স্বরূপ সন্ধান করেও সেখানে কল্পনার প্রার্থিত পরিপূর্ণতা খুঁজে পায় না। এই অভাব বিষয়ীর কল্পনা পূরণ করতে পারে না, বরং পরিহাসময় সমালোচনার মধ্য দিয়ে আধুনিকতার অনিশ্চয়তা, বিচ্ছিন্নতাবোধকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। কবি নিজস্ব উপলব্ধিকে বিষয়ীর প্রতি নিক্ষেপ করার পর যেন একজন পর্যবেক্ষক হয়ে পড়েন এবং তাঁর কবিতার বেশিরভাগ অভিব্যক্তিই এই পর্যবেক্ষকের উচ্চারণের মতো। তিনি 'স্বপ্ন দেখার জিলমিল

জিলিকণি পার হৈ' (স্বপ্ন দেখার ঝলমলে দ্যুতি পার হয়ে) যে 'চহরর প্রাণকেন্দ্র' (শহরের প্রাণকেন্দ্র)-এর দিকে ধাবিত হন সেখানে 'সন্ধিয়া বাটর ভীর, সিনেমার গান কাণত বাজে, পাণ দোকানত হাঁহির তীক্ষ্ণ ধার' (সন্ধের রাস্তার ভিড়, সিনেমার গান কানে বাজে, পানদোকানে হাসির তীক্ষ্ণতা)। এখানে 'নিয়তির স'তে চির সংগ্রামত' (নিয়তির সাথে চিরসংগ্রামে) রত দুর্বল মানুষের 'ক্ষণিকর (ক্ষণিকের) ভয়'-এর মধ্য দিয়ে 'জীয়াই থকার আশা' (বেঁচে থাকার আশা) অনিশ্চয়তায় বন্দি হয়ে থাকে।

এইসব কবির বাইরে বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে 'রামধেনু'-র মাধ্যমে বেশ কয়েকজন কবি 'আধুনিক' কবিতার চর্চায় রত ছিলেন। এঁদের অধিকাংশই আধুনিকতার মর্ম উপলব্ধি করতে না-পারায় কাব্যজগতে স্থান লাভে অসমর্থ হন। তরুণ বয়সে সমালোচক হীরেন গোহাঁই সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "...অস্বীকার করে লাভ নেই, নিকটবর্তী বঙ্গদেশের আধুনিক কবিতার অবুঝ নকল আধুনিক কবিতার জন্মরহস্য।" কিন্তু তাই বলে তিনি আধুনিকতাবাদী কবিদের নিরুৎসাহও করেননি। 'অর্থ ও অনর্থ— আধুনিক অসমিয়া কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন যে "অসমিয়া সাহিত্যের আঙ্গিকে 'অভিনব অবদান' এত বেশি সংখ্যক হতে পারে যে আধুনিক অসমিয়া কবিরা ইচ্ছে করলে অসমিয়া কাব্যকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।" পরবর্তীকালে, বিশেষত ষাটের দশকে ক্ষুরধার সমালোচক (যখন তিনি বয়সে পরিণত) ড. হীরেন গোহাঁই আধুনিক সমালোচনার পথপ্রদর্শক হিসাবে আধুনিক কবিতার দুর্বলতা ও সম্ভাবনার দিকগুলি তুলে ধরে তার বিশৃঙ্খলাদি দূর করতে এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং নিজেও এক ধরনের নতুন ধারার পরিহাসময় ব্যঙ্গকবিতার সৃষ্টি করে আধুনিকতায় আলোকপাত করেছিলেন। ষাটের দশকের আর-একজন সমালোচক ভবেন বরুয়া আমেরিকার নতুন সমালোচনার আদলে কবিতার নিবিড় পাঠ তুলে ধরেছিলেন এবং অসমিয়া কবিদের নতুন রীতিতে ব্যবহৃত পরস্পরবিরোধী উক্তি (বিরোধাভাস নয়), ভাষার বিভ্রান্তি, চিন্তার শিথিলতা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁদের এই সমালোচনার ফলে আধুনিক অসমিয়া কবিতায় যে-সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল তা দূর হয়ে ভাষার ব্যবহারও শক্তপোক্ত হতে শুরু করে এবং সেইসঙ্গে পর্যবেক্ষণে স্পষ্টতা প্রকাশ পায়।

ভবেন বরুয়া নিজেও এই যুগের এক প্রধান কবি। ফরাসি কবি মালার্মের আদর্শের প্রতীকবাদকে তিনিই সম্ভবত ভালো করে আয়ত্ত করেন। অসমিয়া কবিতায় ভবেন বরুয়ার কবিতাকে প্রতীকবাদী কবিতার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাঁর কবিতার কাব্যকৌশলে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'শুভ্রতার স্বর' শিরোনামে তাঁর একটি কবিতায় 'শুভ্রতা'— এক গুণবাচক বিশেষ্য— শুভ্র রঙের বিমূর্ত অবস্থা, তথাপি এর সম্পর্ক দৃষ্টির সঙ্গেই বলে সাধারণ মানুষ মনে করবেন। আবার দৃষ্টির কারণে শুভ্র রং সমস্ত রঙের সমাহার। আমাদের বোধে সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতিই পরস্পরের মধ্যে রূপান্তরিত হতে পারে, সে-কারণেই রাগের ছবি আমরা কল্পনা করতে পারি এবং সেইসঙ্গে ছবির নৃত্যও। সচরাচর অনুভূতির ভিতরে অনুপস্থিত অন্তরানুভূতির প্রক্ষেপ 'শুভ্রতার স্বর' সমাহারে প্রতীকী হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অসমিয়া আধুনিক কবিতার কাব্যকৌশলে বিগত শতকের ষাটের দশকের পরবর্তী পর্বে চিত্রকল্পবাদী রীতির বিশেষ প্রভাব পড়লেও ভবেন বরুয়ার কবিতায় প্রতীকবাদের প্রভাবই অধিক। নীলমণি ফুকনের উল্লিখিত কবিতার প্রথমভাগ এবং ভবেন বরুয়ার কবিতার প্রথমভাগ তুলনা করে দেখলে প্রধানত এটাই চোখে পড়ে। তাঁর 'ধুমুহার প্রান্তত' (ঝড়ের প্রান্তে) কবিতায় 'মৌন' শব্দটি একটি বিশেষণ। কিন্তু কবিতাটিতে ওই শব্দ বিশেষ্যের ভূমিকায় উপস্থিত এবং এক মানসিক অবস্থার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে যেখানে মন যেন 'শুনি রয় নিজরে মৌন'-কে (শুনতে থাকে নিজেরেই মৌনকে)। মৌনকে শোনার কথায় বিরোধাভাস রয়েছে। মনের এক অবস্থাকে প্রকাশ করতে অভিধা বা সংজ্ঞাকে অতিক্রম করে প্রতীকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এই 'মৌন' যেন storm before a calm (ইংরেজিতে calm শব্দটি বিশেষণ ও বিশেষ্যও)। যেন সৃষ্টিশীল মনের শান্ত এক অবস্থাতে সংঘটিত এক quickening। শেষ সারিতে আবার সেটাই দুর্বার হয়ে মৌনী ঝঞ্ঝায় পরিণত হয়। মৌন শব্দটি বিশেষ্যে বিমূর্ত হয়ে শেষে বিশেষণের ভূমিকা নিয়ে এক দুর্বার প্রকাশে সজীব হয়ে ওঠে।

পঞ্চাশের দশকে আধুনিক কবিতা চর্চায় নিবেদিত অপর দুই কবির নাম আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাইছি। এঁদের একজন প্রফুল্ল ভূঞা এবং অন্যজন মহিম বরা। প্রফুল্ল ভূঞা খুব বেশি সংখ্যক কবিতা লেখেননি। তাঁর কবিতায় ভাবের পরিচ্ছন্নতা লক্ষিত হয়। যে-সময়ে অনেক তরুণ কবি বিভ্রান্তিকর ভাষা

ব্যবহার করছিলেন সেই সময়ে তিনি পরিমিতিবোধের শব্দ চয়ন করেছেন এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বিহু নামক একটি কবিতায় নগরমুখী আধুনিক মন লোকজীবনকে যেভাবে পুনরাবিষ্কার করে তার সংবেদনশীল অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। মহিম বরার বৈষ্ণব সাহিত্যে মজ্জিত মনে আধুনিকতার স্পর্শ লাগায় পুরাণের কল্পনা আধুনিক মোচড় (twist) নিয়ে নতুন অর্থের ভিতর দিয়ে দীপ্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর 'মাছ' কবিতার মাছের কাল্পনিক উৎস হল 'মৎস রূপে অবতার হৈলা প্রথমত'— শংকরদেবের দশাবতার থেকে মনে গ্রথিত এক চিত্রকল্প। কিন্তু নিজের কবিতায় এটি প্রতীক হয়ে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়েছে এবং মৃত্যুকে অতিক্রমকারী দুর্বার জীবন প্রবাহের ইঙ্গিত দিয়েছে। 'পুখুরী' (পুকুর) কবিতার সাঁওতালি নাচ লোকজীবনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে আহরিত চিত্রকল্প। শাম্ব পুরাণ-কাহিনির চরিত্র, কিন্তু সেখানে আধুনিক মনের অনিশ্চয়তা প্রকাশ পেয়েছে, কারণ 'জীবনর স্তরে স্তরে পোয়া কয়লার খাদ' এবং 'নতুন মৃত্যুর গোন্ধ প্রতি উষাহত' (নতুন মৃত্যুর গন্ধ প্রতিটি উষায়)। কিন্তু বিষয়ীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও সংস্কৃতি-সৃষ্ট সৌন্দর্য প্রতীক হিসাবেও ধরা পড়েছে। যেমন, 'বরষুণর শেষত শ্যামল উজ্জ্বল পুখুরীর পার, চাওতালী নাচ' (বর্ষণের শেষে শ্যামল উজ্জ্বল পুকুরের পার, সাঁওতালি নাচ) ইত্যাদি। কানায় কানায় পরিপূর্ণ পুকুর অন্যদিকে গর্ভবতী নারীরও প্রতীক। গর্ভবতী পৃথিবীর অভিশপ্ত শাম্বকে গর্ভে ধারণ করার অনুভবের যে-আশঙ্কা তার এক বিকল্প পৃথিবীর কাছ থেকে বিষয়ী আশা করেছে— 'সেয়েহে ব্যাকুল আমি/বাট চাই তোমার উত্তর/চিকুন শ্যামল এটি তোমার উত্তর।' (সেজন্যই আমরা তোমার উত্তরের পথ চেয়ে ব্যাকুল, তোমার একটি মসৃণ শ্যামল উত্তর।)

ষাটের দশকে এক অধ্যয়নপুষ্ট মন নিয়ে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অসমিয়া কাব্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন এবং আধুনিকতাবাদী রীতি অনুসরণ করে আয়ত্তও করেছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আধুনিকতাবাদী কবিদের মধ্যে প্রতীকবাদ ও চিত্রকল্পবাদের বেশি প্রভাব পড়েছিল সে-সময়ে। ফলে যে-বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছিল তা হল শব্দ-সচেতনতা। শব্দের গীতিময় ও চিত্রময় সম্ভাবনাকে একেকজন কবি তাঁদের কাব্যকৌশলে ব্যবহার করেছিলেন। সেই পথে না-গিয়ে কবি হীরেন্দ্রনাথ যে-পথটি বেছে নিলেন সেখানে মনের এক উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। তিনি ব্যবহার করতে শুরু করলেন ইংরেজি মেটাফিজিক্যাল কবিতায় প্রাপ্ত 'উইট'-এর উৎপ্রেক্ষাধর্মী ব্যবহার। স্যামুয়েল জনসন এ-ধরনের কাব্যালংকারকে ভিন্নধর্মী চিন্তার জবরদস্ত সংযোজন বলে ভর্ৎসনা করেছিলেন। কিন্তু উইট-এর অভিনব ইঙ্গিতধর্মী বৌদ্ধিক শক্তি এলিয়ট ও ক্লিয়াস্থ ব্রুক্স দেখিয়েছিলেন এবং এলিয়ট নিজে ব্যবহার করেছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ হুজুগের বশবর্তী হয়ে এই কাব্যকৌশলের আশ্রয় নেননি। প্রথম বয়সের নিসর্গ-প্রধান জীবনক্ষেত্রের আঞ্চলিক ভাষায় সমৃদ্ধ নিজস্ব প্রকাশভঙ্গির (idiomatic) শব্দসম্ভার ও পরবর্তী জীবনের বৌদ্ধিক পরিক্রমার ভিতরে আহৃত বুদ্ধিদীপ্ত মিশ্রণ তাঁর কাব্যকৌশলে পাওয়া যায়। তাঁর 'অস্তাচল' কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি এ-রকম : "নিলগত ঘরে ঘরে শেয়ালি ফুলর দরে/শোঅনি পাটিত সিঁচি রিমজিম স্বাদর কুঁঅলী/মালিনী রাতিয়ে ঢালে বিরতির মাদকতা তাতে/ মোর হলে অন্তহীন এই পথারত/স্মৃতির জোনাকীবোরে/কাবুলিআলার দরে/ঘূরি ঘূরি চক্রবৃদ্ধি লোটে।" (দূরে ঘরে ঘরে শেফালি ফুলের মতো/বিছানার পাটিতে রিমঝিম স্বাদের কুয়াশা ছিটিয়ে/মালিনী রাত যেন ঢালে বিরতির মাদকতা তাতে/আমার হলে এই অন্তহীন মাঠে/স্মৃতির জোনাকিদল কাবুলিঅলার মতো/ঘুরে ঘুরে চক্রবৃদ্ধি লোটে।) এই কবিতায় ধ্বনির অনুপ্রাসে ব্যঞ্জনাও ফুটে ওঠে (যেমন শ-শ-স-স্ব; র-র-র-র-র-র-র এবং ম-ম-ম-স্ম ইত্যাদির অনুপ্রাস)। কিন্তু এখানে 'রিমজিম স্বাদর কুঁঅলী' 'মালিনী রাতি'-তে ঢেলে দেওয়া 'বিরতির মাদকতা' এবং অন্যদিকে কাবুলিঅলার মতো 'স্মৃতির জোনাকী'গুলো 'চক্রবৃদ্ধি' হারে সুদেমূলে আদায় করার বিরক্তি। এখানেও আমরা এক চিত্রকল্প পাই, কিন্তু সেটা বুদ্ধিদীপ্ত উইটের ইঙ্গিতধর্মী সংমিশ্রণে সৃষ্ট বৌদ্ধিক তাৎপর্যের ভিতর দিয়ে এসেছে। এখানে এক সমালোচনাধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে আধুনিকতার মর্মে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন কবি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

এবার উল্লেখ করা যেতে পারে একজন প্রথম দিককার আধুনিকতাবাদী কবির কাব্যিক প্রয়াসের কথা। মহেন্দ্র বরা ছিলেন আধুনিকতাবাদী কবিতার একজন ঘোরতর সমর্থক বা প্রবক্তা। তিনি এই ধারার কবিতার বিরোধী সমালোচকদের প্রত্যুত্তর দেওয়ার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিলেন। বয়সে নবকান্ত বরুয়ার চেয়ে তিনি বছর তিনেকের ছোট হলেও কবি হিসাবে সমসাময়িক। নবকান্তের স্তর স্পর্শ করতে না-পারলেও আধুনিকতাবাদী কবিতাকে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য

তিনি যথেষ্ট প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তাঁর এই অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারার কবিতার প্রথম সংকলন 'নতুন কবিতা'-র সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

আধুনিকতাবাদী সব কবির কবিতাতেই যে ব্যক্তিমনে নিমজ্জিত অনুভূতির আলোড়নের প্রকাশ ছিল তেমন নয়। প্রগতিবাদী কবিতার বামপন্থী চিন্তার মধ্য দিয়ে আধুনিক সময়ের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন কয়েকজন কবি। এঁদের মধ্যে সার্থক কবি হলেন রবীন্দ্র সরকার। সত্তরের দশকে কবিতা লেখার সূত্রপাত তাঁর। সেই সূত্রে তিনি নিজেকে 'সত্তরর (সত্তরের) পদাতিক' বলে ঘোষণা করেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে সর্বহারার জীবন, তাই বলে তিনি প্রকৃতিকেও ভুলে থাকতে পারেন না। 'নরকত বসন্ত' (নরকে বসন্ত) কবিতায় তেমন এক সর্বহারার জীবন প্রকৃতির সৌন্দর্যের পরিপ্রেক্ষিতে কবি বিচার করেছেন এবং সেখানে ফুটে উঠেছে পরিহাসময় করুণা— "ডাস্টবিনত রঙা লাউর স্থূলতাত/নাগরিক যন্ত্রণাই চক খায়.../তথাপি বহাগ আহে।/কৃষ্ণচূড়া রঙে রঙে আরু রঙা হয়/বাটর কাষর নঙঠা লরাটোয়ে/লঘোনে মাকজনী মরার পিছত/বাছ স্টপত থিয় হৈ/রৈ রৈ সুহুরি দি কুলির মাত মাতে/আঃ নরকত এতিয়া বসন্ত।" (ডাস্টবিনে মিষ্টিকুমড়োর স্থূলতায়/নাগরিক যন্ত্রণা ঘুরপাক খায়.../তবুও বৈশাখ আসে।/কৃষ্ণচূড়া রঙে রঙে আরও লাল হয়/রাস্তার ধারে ন্যাংটো ছেলেটা/উপোসে মায়ের মৃত্যুর পর/বাস স্টপে দাঁড়িয়ে/মাঝে মাঝে শিস দিয়ে কোকিলের ডাক ডাকে/আঃ নরকে এখন বসন্ত।)

আগেই উল্লেখ করেছি যে আধুনিকতাবাদী অসমিয়া কবিতায় চিত্রকল্পবাদ ও প্রতীকবাদের প্রভাব পড়েছিল যথেষ্ট। তবু তারই মধ্যে একজন কবি ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি কবীন ফুকন। তাঁর কবিতায় ভাষার বৈশিষ্ট্য অন্য সব আধুনিকতাবাদী কবির থেকে পৃথক। আধুনিকতাবাদীরা নতুন এক কাব্যিক ভাষা তৈরি করার জন্য রোমান্টিক কবিদের ব্যবহৃত বহু শব্দ পরিহার করেছিলেন, কারণ তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে বহু ব্যবহারের ফলে এই শব্দগুলি ভাবনার ব্যঞ্জনাময় প্রকাশের ক্ষেত্রে নির্জীব হয়ে পড়েছিল। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বহু বিষয়বস্তুকে তাঁরা এড়িয়ে চলতেন কিংবা নতুন প্রসঙ্গের মাধ্যমে ওই ধরনের শব্দের চেহারা পালটে অন্য ধরনের (অচেনা) করে নিতেন। কিন্তু কবীন ফুকন দেখালেন যে এ-রকম বহু নির্জীব ধরনের শব্দ উপযুক্ত চয়নে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠতে পারে এবং সেটার আদল পালটে (অচেনা শব্দ) ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। নবকান্ত বরুয়া তাঁর 'সন্ধ্যার রেপ'চডি' কবিতায় ব্যঙ্গ পরিহাসের সুর এনে অসমিয়া মনে 'জোন' (চাঁদ)-এর অতি পরিচিত রূপ ভেঙে দিয়ে নতুন প্রসঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাকে রোমান্টিক আবেশ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কবীন ফুকন 'তোক দেখি ন জোনে' নামক কবিতায় সচেতনভাবে এর বিপরীতে গিয়ে 'জোন'-কে রোমান্টিকের অভ্যস্ত সমাধানেই ফিরিয়ে এনেছেন, কিন্তু আধুনিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে প্রশ্নের স্থানে রাখা হয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধের লেখক তাঁর কবিজীবন শুরু করেন প্রতীকবাদের প্রভাবের মধ্য দিয়ে। তাঁর 'সমুদ্রভীতি' কবিতায় 'সাগর' হল কালের প্রতীক, যে 'কাল'-এর পার দেখা যায় না অর্থাৎ এক অনন্তকাল এবং যে-কাল সৃষ্টিশীল। কিন্তু কালের অন্য একটি রূপও আছে, ইতিহাসের কাল, যার প্রতীক এই কবিতায় 'সিন্ধু'। একটি প্রবহমান 'নদী', কিন্তু যার অন্ত পড়ে সাগরে অর্থাৎ অনন্তকাল বা মহাকালে গিয়ে। নিজের সৃষ্টিকার্যের বিনাশের সম্ভাবনা কবিকে ভীতিগ্রস্ত করেছে, কিন্তু অনন্তকালের সৃষ্টিশীলতা তাঁকে এই ভীতি থেকে মুক্তও করেছে। পরবর্তী সময়ের কবিতায় কবি প্রতীকবাদের প্রভাব থেকে সরে এসেছেন এবং অভিজ্ঞতার রূপকের সন্ধান করেছেন। তাঁর পরের দিককার কবিতায় চিত্রকল্প ও বর্ণনার ওতপ্রোত সংযোগ ঘটেছে।

এর পরবর্তী কবিরা হলেন 'তরুণ প্রজন্ম', স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে জন্মগ্রহণকারী কবিরা। এঁদের মধ্যে আনিচ-উজ-জামান এবং তরুণ বরুয়ার কবিতায় চিত্রকল্পবাদের প্রভাব রয়েছে। আনিচ-উজ-জামান নৈর্ব্যক্তিকতাকে অনুকরণ করা ছেড়ে দিয়ে পরে ব্যক্তিত্ব প্রকাশে গুরুত্ব দেন। কিন্তু তাঁর কবিতা নতুন স্তরে উপনীত হতে সক্ষম হয়নি। তথাপি তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রথম সারির কবি। অন্যদিকে তরুণ বরুয়া সম্ভাবনাময় কবি হলেও পরের দিকে যেন প্রায় থেমে গেলেন। পরবর্তী সময়ে যাঁরা ক্রমান্বয়ে উঠে এসেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রফিকুল হুসেইন, সমীর তাঁতী, সনন্ত তাঁতী, নীলিম কুমার, অনুভব তুলসী, বিপুলজ্যোতি শইকীয়া, জীবন নরহ, মনোজ বরপূজারী, রাজীব বরুয়া, সৌরভ শইকীয়া, প্রয়াগ শইকীয়া প্রমুখ। এঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় এবং প্রতিভাধর। তবে এঁদের চেয়ে তরুণতর কবিদের মধ্যে কমলকুমার তাঁতী, বিজয়শংকর বর্মন এবং প্রণবকুমার বর্মনের নাম উল্লেখযোগ্য। মঞ্চসুলভ তরল

জনপ্রিয়তার প্রতি আকর্ষণ পরিত্যাগ করতে পারলে প্রণবকুমার বর্মনের সম্ভাবনা অন্য দুজনের চেয়ে বেশি। চপলতা তাঁর অনেক কবিতার সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়।

দ্ব্যর্থকতা (ambiguity), বিরোধাভাস (paradox) আধুনিকতাবাদী কবির পরিহাসময় দৃষ্টিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁদের কবিতায় প্রত্যয়ের চেয়ে অনিশ্চয়তা, স্বস্তির চেয়ে শঙ্কা, আস্থার চেয়ে প্রশ্ন এবং আবেগের চেয়ে নির্লিপ্তি বেশি। এই ধারা কতদিন স্থায়ী হবে তা বলা মুশকিল। কারণ, অতি সাম্প্রতিক কবিতায় রোমান্টিক আবেগের প্রকাশ যেন ফিরে এসেছে বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তার পাশাপাশি দৃষ্টির অক্ষরেখাও সংকীর্ণ বা ছোট হয়ে ফুটে উঠেছে। আগেকার যুগের রোমান্টিক কবিদের দিগন্তব্যাপী প্রসারিত যে-দৃষ্টি লক্ষ করা গিয়েছিল তার সন্ধান এই প্রজন্মের কবিদের কবিতায় মেলে না। ❑